টেনিদা সমগ্র

ঝাউ বাংলোর রহস্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

- ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তী. 2
- সেই সবুজ দাড়ি 9
- ফরমুলা বনাম কাগামাছি. 17
- চকোলেট নাম্বার টু 25
- ঝাউ- বাংলোয় 35
- বিনামূল্যে ফিল্ম শো 44
- কাটামুণ্ডুর নাচ 52
- রাতের তদন্ত. 59
- সাতকড়ি গায়েব 66
- শত্রুর ভীষণ আক্রমণ 72
- ক্যাচ- কট- কট 79
- পুণ্ডরীক কুণ্ডু এবং রহস্যভেদ 87

ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তী

কথা ছিল, আমরা পটলডাঙার চারজন—টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর আমি শ্রীমান্ প্যালারাম-গরমের ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে যাব। কলকাতায় একশো সাত ডিগ্রি গরম চলছে, দুপুর বেলা মোটর গাড়ির চাকার তলায় লেপটে যাচ্ছে গলে যাওয়া পিচ, বাতাসে আগুন ছুটছে। গরমের ধাক্কায় আমাদের পটলডাঙার গোপালের মতো সুবোধ কুকুরগুলো পর্যন্ত খেকি হয়ে উঠেছে। একটাকে তাক করে যেই আমের আঁটি ছুঁড়েছি, অমনি সেটা ঘ্যাঁক করে তেড়ে এল। আমের আঁটিটা একবার চাটা তো দূরে থাক, খুঁকে পর্যন্ত দেখলে না!

এরপর আর থাকা যায় কলকাতায়? তোমরাই বলো?

আমরা চারজনেই এখন সিটি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি, আর ছেলেমানুষ নই। তায় সামার ভ্যাকেশন। কাজেই বাড়ি থেকে পারমিশন পেতে দেরি হল না। খালি মেজদার বকবকানিতেই কানের পোকা বেরিয়ে যাওয়ার জো। নতুন ডাক্তার হয়েছে সব সময়ে তার বিদ্যে ফলানো চাই! আরও বিশেষ করে মেজদার ধারণা, আমি একটা জলজ্যান্ত হাসপাতাল। পৃথিবীর সমস্ত রোগের মূর্তিমান ডিপো হয়ে বসে আছি, তাই যত বিটকেল ওষুধ আমার গেলা দরকার। সারাদিন ধরে আমাকেই পুটুস-পুটুস করে ইনজেকশন দিতে পারলে তবেই মেজদার আশা মেটে!

মেজদা বলল—যাচ্ছিস যা, কিন্তু খুব সাবধান! তোর তো খাবার জিনিস দেখলেই আর মাথা ঠিক থাকে না। সে চীনেবাদামই হোক আর ফাউল কাটলেটই হোক। হুঁশিয়ার হয়ে খাবি, সিঞ্চল লেক থেকে দার্জিলিঙে যে-জল আসে, সেটা এমনিতেই খারাপ, তার সঙ্গে যদি যা-তা খাস, তাহলে স্রেফ হিল-ডাইরিয়া হয়ে বেঘোরে মারা যাবি।

এ-সব কথার জবাব দেবার কোনও মানে হয় না। আমি গোঁজ হয়ে রইলুম।

তারপরে বাবা আর মায়ের উপদেশ, বড়দার শাসানি-লেখাপড়া শিকেয় তুলে দিয়ে একমাস ধরে ওখানে আড্ডা দিয়ো না। ছোড়দির তিন ডজন গোল্ড স্টোন, ছ-ছড়া পাথরের মালা, ছখানা ওয়ালপ্লেটের ফরমাস। শুনতে শুনতে দিকদারি ধরে গেল। কোনওমতে পেন্নাম-টেন্নাম সেরে শিয়ালদা স্টেশনে এসে হাড়ে বাতাস লাগল।

বাকি তিন মূর্তি অনেক আগেই এসে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় জমিয়ে বসেছে। বেশি খুঁজতে হল না, টেনিদার বাজখাঁই গলার ডাক শোনা গেল-চলে আয় প্যালা, ইদিকে চলে আয়-

দেখি তিনজনেই তারিয়ে-তারিয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাচ্ছে।

গাড়িতে উঠে ঝুপ করে বাক্স-বিছানা রেখে প্রথমেই বললুম,বারে, আমার অরেঞ্জ স্কোয়াশ?

—তরটা কাটা গেছে। লেট কইর‍্যা আসছস, তার ফাইন।

হাবুল সেন জানিয়ে দিলে।

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে প্রতিবাদ জানালুম-লেট মানে? এখনও কুড়ি মিনিট দেরি আছে ট্রেন। ছাড়তে।

—যদি কুড়ি মিনিট আগেই ট্রেন ছেড়ে দিত, কী করতিস তা হলে? টেনিদা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে।

-কেন কুড়ি মিনিট আগে ছাড়বে?

-রেখে দে তোর টাইম টেবিল! চোঁ-চোঁ করে অরেঞ্জ স্কোয়াশটা সাবাড় করল টেনিদা। ও তো রেল কোম্পানির একটা হাসির বই। এই তো পরশু জেঠিমা এল হরিদ্বার থেকে দুন এক্সপ্রেসে চেপে। ভোর পাঁচটায় গাড়িটা আসবে বলে টাইম

টেবলে ছাপা রয়েছে, এল বেলা বারোটার সময়। সাতঘণ্টা লেট করে গাড়ি আসতে পারে, আর কুড়ি মিনিট আগে ছেড়ে দিতে পারে না? কী যে বলিস তার ঠিক নেই।

যত বাজে কথা!—আমি চটে বললুম, আমিও একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাব।

টেনিদা বললে–খাবিই?

–খাবই।

—নিজের পয়সায়?

—নিশ্চয়।

ক্যাবলা বললে, তোর যেরকম তেজ হয়েছে দেখছি তাতে তোকে ঠেকানো যাবে না। তা হলে কিনেই ফেল। চারটে। মানে চারটেই তোর নিজের জন্য নয়, আমরাও আছি।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে–হ, এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতাছি।

টেনিদা বললে–ডিটো।

ছাড়ল না। চারটে কেনাল আমাকে দিয়ে। আর সেগুলো আমরা শেষ করতে না করতেই টিং-টিং-টিঙা-টিং করে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের ঘণ্টা পড়ল।

পথের বর্ণনা আর দেব না, তোমরা যারা দার্জিলিঙে গেছ তারা সবাই তা ভালো করেই জানো। সকরিগলির স্টিমারে গলাগলি করে মনিহারিতে হারি-কি-জিতি বলে বাক্স ঘাড়ে করে বাড়ির ওপর দিয়ে রেস লাগিয়ে সে যে কী দারুণ অভিজ্ঞতা সে আর বলে কাজ নেই। ক্যাবলা আছাড় খেয়ে একেবারে কুমড়োর মতো গড়িয়ে গেল, কোত্থেকে কার এক ভাঁড় দুই এসে হাবুল সেনের মাথায় পড়ল, আমার বাঁ

পা-টা একটুখানি মচকে গেল আর ছোট লাইনের গাড়িতে উঠবার সময় একটা ফচকে চেহারার লোকের সঙ্গে টেনিদার হাতাহাতির জো হল।

এই সব দুর্ঘটনার পাট মিটিয়ে গুড়গুড়িয়ে আমরা শিলিগুড়িতে পৌঁছলুম ভোরবেলায়। দূরে নীল হয়ে রয়েছে হিমালয়ের রেখা, শাদা মেঘ তার ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্টেশনের বাইরে বাস আর ট্যাক্সির ভিড়।

দার্জিলিং-দার্জিলিং—খরসাং-

—কালিম্পং-কালিম্পং-

টেনিদার সঙ্গে মনিহারিতে যে-মারামারি করবার চেষ্টা করছিল সেই ফচকে চেহারার মিচকে লোকটা একটা বাসের ভেতরে বসে মিটমিট করে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। দেখলুম, শিলিগুড়ির এই গরমের ভেতরই লোকটা গায়ে নীল রঙের একটা মোটা কোট চড়িয়েছে, গলায় জড়িয়েছে মেটে রঙের আঁশ-ওঠা-ওঠা একটা পুরনো মাফলার। মুখের সরু গোঁফটাকে বাগিয়ে এমন একখানা মুচকি হাসি হাসল যে পিত্তি জ্বলে গেল আমাদের।

লোকটা গলা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—কী হে খোকারা, দার্জিলিং যাবে?

এসব বাজে লোকের বাজে কথায় কান দিতে নেই। কিন্তু মনিহারি থেকে চটেই ছিল টেনিদা। গাঁ-গাঁ করে বলল—আপনার মতো লোকের সঙ্গে আমরা কোথাও যেতে চাই না।

লোকটা কি বেহায়া! এবারে দাঁত বের করে হাসল। আমরা দেখতে পেলুম, লোকটার উঁচু-উঁচু দাঁতগুলো পানের ছোপ লাগানো, তার দুটো আবার পোকায় খাওয়া।

—যাবে না কেন? বাসে বিস্তর জায়গা রয়েছে, উঠে পড়ো।

—না।

–না কেন?—তেমনি পানে রাঙানো পোকায় খাওয়া দাঁত দুটো দেখিয়ে ফচকে লোকটা চোখ কুঁচকে হাসল। অ-রাগ হয়েছে বুঝি? তা রেলগাড়িতে ওঠানামার সময় অমন দুচারটে কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে! ওজন্যে কিছু মনে করতে নেই। তোমরা হচ্ছ আমার ছোট ভাইয়ের মতো, আদর করে একটু কান-টান মলে দিলেই বা কী করতে পারতে? এসো খোকারা, উঠো এসো। আমি তোমাদের পথের সিনারি দেখাতে-দেখাতে নিয়ে যাব।

অস্পর্ধা দেখ, আমাদের কান মলে দিতে চায়। লোকটা বাসে চেপে না থাকলে নির্ঘাত টেনিদার সঙ্গে হাতাহাতিই হয়ে যেত। টেনিদা চিৎকার করে বলল শাট আপ।

লোকটা এবার হি-হি করে হাসল।

—গেলে না তো আমার সঙ্গে? হায়, তোমরা জানো না, তোমরা কী হারাইতেছ!

—আমরা জানতে চাই না।

ভোঁপ ভোঁপ শব্দ করে বাসটা ছেড়ে দিলে। লোকটা গলা বাড়িয়ে আবার বললে- তোমাদের একটা চকোলেট প্রেজেন্ট করে যাচ্ছি। হয়তো পরে আমার কথা ভাববার দরকার হবে তোমাদের। তখন আর এত রাগ থাকবে না।

বলতে বলতে কী একটা ছুঁড়ে দিলে আমাদের দিকে আর পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের উইকেটকিপার ক্যাবলা নিছক অভ্যাসেই সেটা খপ করে ধলে ফেলল।

চকোলেটই বটে! পেল্লায় সাইজের একখানা!

ক্যাবলা বলল—এটা ফেলে দিই টেনিদা?

চটে গেলেও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে টেনিদার ভুল হয় না। ঝাঁ করে চকোলেটটা কেড়ে নিল ক্যাবলার হাত থেকে। মেজাজ চড়েই ছিল, একেবারে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল।

–ইঃ, ফেলে দেবেন! অত বড় একটা চকোলেট ফেলে দিতে যাচ্ছেন। একেবারে নবাব সেরাজদ্দৌল্লা এসেছেন। এটা আমার। আমিই তো ঝগড়া করে আদায় করলুম।

—আমরা ভাগ পামু না টেনিদা?-হাবুল সেন জানতে চাইল।

টেনিদা গম্ভীর হল!—পরে কনসিডার করা যাবে।-বলে চকোলেটটা পকেটস্থ করল।

সামনে বাস আর ট্যাক্সি সমান ডাকাডাকি করছে-দার্জিলিং-খরসাং-কালিম্পং-

আমি বললুম-দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে টেনিদা? একটা বাসে-টাসে উঠে পড়া যাক।

-দাঁড়া না ঘোড়ার ডিম। আগে সোরাবজীর রেস্তোরাঁ থেকে ভালো করে রেশন নিয়ে নিই। নইলে পঞ্চাশ মাইল পাহাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবে। চল, খেয়ে আসা যাক।

খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ঠিক করতে আরও ঘণ্টাখানেক গেল। তারপর বাক্স খুলে গরম কোট-টোট বের করে নিয়ে আমরা রওনা হলুম দার্জিলিঙের পথে।

নীল পাহাড়ের দিকে আমাদের গাড়িখানা ছুটে চলল তীরের বেগে। চমৎকার রাস্তা। একটু এগিয়ে চায়ের বাগান, তারপর দুধারে শুরু হয়ে গেল শালের বন। ঠাণ্ডা ছায়া আর হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল যেন। আমি বেশ উদাস গান জুড়ে দিলাম আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি–

সূচিপত্র

হাবুল সেন কানে হাত চাপা দিয়ে বললে–ইস, কী একখানা সুরই বাইর করতাছস! গানটার বারোটা তো বাজাইলি!

না হয় গলার সুর-টুর আমার তেমন নেই। তাই বলে হাবুল সেন সেকথা বলবার কে! ও তো গলা দিয়ে একটি সুর বের করতে পারে, সেটা হল গর্দভরাগিণী। আমি চটে বললুম-আহা-হা, তুই তো একেবারে সাক্ষাৎ গন্ধর্ব।

ক্যাবলা বললে–তুমলোগ কাজিয়া মত করো। (ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে থাকত, তাই মধ্যে মধ্যে হিন্দী জবান বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে) আসল কথা হল, প্যালার এই গানটি এখানে গাইবার কোনও রাইট নেই। এই বনের ভেতর ও স্বচ্ছন্দেই মারা যেতে পারে। আমরা বাধা দিলেও মারা যেতে পারে, কিন্তু এখানে কিছুতেই ওর জন্ম হয়নি। যদি তা হত, তা হলে ও গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত, আমাদের সঙ্গে এই মোটরে কিছুতেই বসে থাকত না।

আমাকে বাঁদর বলছে নাকি? একটু আগেই গাছে গোটাকতককে দেখা গেছে সেইটেই ওর বক্তব্য নয় তো?

আমি কী যেন বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টেনিদা।–এর মানে কী? কী মানে হয় একবিতার?

কবিতা? কিসের কবিতা? আমরা তিনজনে টেনিদার দিকে তাকালুম। একটা নীল রঙের ছোট কাগজ ওর হাতে।

–কোথায় পেলে ওটা?

টেনিদা বললে–ওই চকোলেটর প্যাকেটের ভেতর ভাঁজ করা ছিল।

টেনিদার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে হাবুল সেন পড়ল–

মিথ্যে যাচ্চ দার্জিলিং
সেখানে আছে তির শিং।
যাবে তো যাও নীলপাহাড়ি, সে
থায় নড়ে সবুজ দাড়ি।
সেইখানেতে ঝাউবাংলায়
(লেখা নেইকো বুড়ো আংলায়)
গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়।

—শীঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তী

আমরা চারজন কবিতা পড়ে তো একেবারে থ। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে মাথা চুলকে ক্যাবলা বলল—এর অর্থ কী?

দুধারের ছায়াঘেরা শালবনের ভেতর থেকে এর কোনও অর্থ খুজে পাওয়া গেল না।

সেই সবুজ দাড়ি

তারপর দার্জিলিঙে গিয়ে আমরা তো সব ভুলে গিয়েছি। আর দার্জিলিঙে গেলে কারই বা অন্য কথা মনে থাকে বলে! তখন আকাশ জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝলমল করে, ম্যাল দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটে, জলাপাহাড়ে উঠছি তো উঠছিই। সিঞ্চলের বুনো পথে কত রকম পাখি ডাকছে। কলকাতার গরমে মানুষ যখন আইঢাই করছে আর মনের দুঃখে আইসক্রিম খাচ্ছে, তখন গরম কোট গায়ে দিয়েও আমরা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি।

আমরা উঠেছিলাম স্যানিটোরিয়ামে। হুল্লোড়ের এমন জায়গা কি আর দার্জিলিঙে আছে। পাহাড় ভেঙে ওঠানামা করতে এক আধটু অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু দিব্যি জায়গাটি। তা ছাড়া খাসা সাজানো ফুলের বাগান, মস্ত লনে ইচ্ছে করলে ক্রিকেট ফুটবল খেলা যায়, লাইব্রেরির হলে টেবিল-টেনিস আর ক্যারামের বন্দোবস্ত।

খাই-দাই, খেলি, ঘোড়ায় চড়ি, বেড়াই আর ফটো তুলি। এক বটানিকসেই তো শ-খানিক ছবি তোলা হল। এমনি করে চার-পাঁচদিন মজাসে কাটাবার পর একদিন ক্যাবলাটাই টিকটিক করে উঠল।

–দুৎ, ভালো লাগছে না।

আমরা তিনজন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

—ভালো লাগছে না মানে?

-মানে, ভালো লাগছে না।

টেনিদা চটে বললে- কলেজে ক্লাস করতে পারছে না কিনা, তাই ওর মন খারাপ। এখানকার কলেজ তো ভোলাই রয়েছে। যা না কাল লজিকের ক্লাসে ঢুকে পড়।

ক্যাবলা বললে–যাও-যাও!

হাবুল সেন বললে–আমরা যামু ক্যান? আমরা এইখানে থাকুম। তর ইচ্ছা হইলে তুই যা গিয়া। যেইখানে খুশি।

ম্যালের বেঞ্চিতে বসে আমরা চারজনে চীনেবাদাম খাচ্ছিলুম, ক্যাবলা তড়াক করে উঠে পড়ল। বললে–তা হলে তাই যাচ্ছি। যাচ্ছি গাড়ি ঠিক করতে। কাল ভোরে আমি একাই যাব টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে।

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে একখানা লম্বা হাত বের করে ক্যাবলাকে পাকড়ে ফেলল।

—আরে তাই বল, টাইগার হিলে যাবি। এ তো সাধু প্রস্তাব। আমরাও কি আর যাব না?

-না, তোমাদের যেতে হবে না। আমি একাই যাব। হাবুল গম্ভীর হয়ে বললে-পোলাপানের একা যাইতে নাই টাইগার হিলে। বাঘে ধইরা খাইব।

—ওখানে বাঘ নেই।-ক্যাবলা আরও গম্ভীর।

আমি বললুম-বেশ তো, মোটরের ভাড়াটা তুই একাই দিস। তোর যখন এত জেদ চেপেছে তখন না হয় একাই যাস। আমরা শুধু তোর বডিগার্ড হয়ে যাব এখন। মানে তোকে যদি বাঘে-টাঘে ধরতে আসে-

ক্যাবলা হাত-পা নেড়ে বললে-দুত্তোর, এগুলোর খালি বকরবকর। সত্যিই যদি যেতে হয়, চলো এইবেলা গাড়ি ঠিক করে আসি, কদিন ধরে আবহাওয়া ভালো যাচ্ছে—বেশি মেঘ বা কুয়াশা হলে গিয়ে শীতে কাঁপাই সার হবে।

পরদিন ভোর চারটায় টাইগার হিলে রওনা হলুম আমরা। বাপ, কী ঠাণ্ডা। দার্জিলিঙ ঠাণ্ডায় জমে আছে। ঘুম স্টেশন রাশি রাশি লেপ কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঘুমে অচেতন। শীতের হাওয়ায় নাক কান ছিঁড়ে উড়ে যাওয়ার জোর। ল্যান্ড রোভার গাড়ি, ঢাকাঢাকি বিশেষ নেই, প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠল।

টেনিদা চটে বললে-ধুত্তোর ঘোড়ার ডিমের টাইগার হিল। ক্যাবলার বুদ্ধিতে পড়ে যত ভোগান্তি। একেবারে জমিয়ে দিলে।

হাবুল বললে-হ, আমাগো আইসক্রিম বানাইয়া ছাড়ব।

লেপ-টেপগুলো গায়ে জড়িয়ে এলে ভালো হত।—আমি জানালুম।

ক্যাবলা বললে-অত বাবুগিরির শখ যখন, কলকাতায় থাকলেই পারতে। পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত লোক টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে আসে আর এইটুকু ঠাণ্ডায় ওঁদের একেবারে প্রাণ বেরিয়ে গেল!

—অ—এইটুকু ঠাণ্ডা। দাঁত ঠকঠকিয়ে টেনিদা বললে-!—এইটুকু ঠাণ্ডায় বুঝি তোর মন ভরছে না! আচ্ছা বেশ, কাল মাঝরাতে তোকে এক বালতি বরফ জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেব এখন।

আমি বললুম—শরীর গরম করার বেস্ট উপায় হচ্ছে গান। এসো, কোরাসে গান ধরা যাক।

টেনিদা গজগজ করে কী যেন বললে, ক্যাবলা চুপ করে রইল, কিন্তু গানের নামে হাবুল একপায়ে খাড়া। দুজনে মিলে যেই গলা ছেড়ে ধরেছি : হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো অমনি নেপালী ড্রাইভার দারুণ আঁতকে হাঁই-হাঁই করে উঠল। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে-অমন বিচ্ছিরি করে চেঁচিয়ে চমকে দেবেন না বাবু। খাড়া পাহাড়ি রাস্তা—শেষে একটা অ্যাঁক্সিডেন্ট করে ফেলব।

কী বেরসিক লোক!

টেনিদা মোটা গলায় বললে- রাইট। গান তো নয় যেন একজোড়া শেয়াল কাঁঠাল গাছের তলায় বসে মরা কান্না জুড়েছে।

ক্যাবলা ফিকফিক করে হাসতে লাগল। আর আমি ভীষণ মন খারাপ করে বসে রইলুম। হাবুল আমার কানে ফিসফিস করে সান্ত্বনা দিয়ে বললে-তুই দুঃখ পাইস না প্যালা। কাইল তুই আর আমি নিরিবিলিতে বার্চ-হিলে গিয়া গান করুম। এইগুলান আমাগো গানের কদর কী বুঝব!

যাই হোক, টাইগার-হিলে তো গিয়ে পৌঁছানো গেল। সেখানে এর মধ্যেই বিস্তর গাড়ি আর বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে। পাহাড়ের মাথায় সানরাইজ দেখার যে-জায়গাটা রয়েছে। তার একতলা-দোতলা একেবারে ভর্তি। আমরা পাশাপাশি করে দোতলায় একটুখানি দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে নিলুম।

সামনের অন্ধকার কালো পাহাড়টার দিকে চেয়ে আছি সবাই। ওখান থেকেই সুর্য উঠবে, তারপর বাঁ দিকের ঘুমন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সাতরঙের মায়া ছড়িয়ে দেবে। রাশি রাশি ক্যামেরা তৈরি হয়ে রয়েছে। পাহাড় আর বনের কোলে থেকে-থেকে কুয়াশা ভেসে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

তারপর সেই সূর্য উঠল। কেমন উঠল? কী রকম রঙের খেলা দেখা দিল মেঘ আর কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপরে? সে আর আমি বলব না। তোমরা যারা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখেছ, তারা তো জানোই; যারা দেখোনি, না দেখলে কোনওদিন তা জানতে পারবে না।

ক্লিক ক্লিক ক্লিক। খালি ক্যামেরার শব্দ। আর চারদিকে শুনতে পাচ্ছি, অপূর্ব! অদ্ভুত! ইউনিক।

টেনিদা বললে–সত্যি ক্যাবলাকে মাপ করা যেতে পারে। এমন গ্র্যান্ড সিনারি কোনওদিন দেখিনি।

ঠিক সেই সময় পাশ থেকে মোটা গলায় কে বললে–তাই নাকি? কিন্তু এর চেয়েও ভালো সিনারি দেখতে হলে নীল-পাহাড়িতেই যাওয়া উচিত তোমাদের।

নীলপাহাড়ি! আমরা চারজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই অদ্ভুত ছড়াটার কথা মনে পড়ে গেল আমাদের।

একটা ঢাউস কম্বলে লোকটার মুখ-টুক সব ঢাকা, শুধু নাকটা বেরিয়ে আছে। সে আবার মোটা গলায় সুর টেনে বললে–

গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়।

বলেই সে কম্বলটা সরিয়ে নিলে আর আবছা ভোরের আলোয় আমরা দেখলুম, তার গলায় আঁশ-ওঠা একটা চকোলেট রঙের মাফলার জড়ানো, তার মিচকি মুখে মিচকি হাসি।

–কে?–কে?–বলে টেনিদা যেই চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি চারদিকের ভিড়ের মধ্যে কোথায় সুট করে মিলিয়ে গেল লোকটা।

কিন্তু সেই গাদাগাদি ভিড়ের ভেতর কোথাও আর তাকে দেখা গেল না। দোতলায় নয়, একতলায় চায়ের স্টলে নয়, এমনকি বাইরে যেসব গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভেতরেও কোথাও নয়। যেন কুয়াশার ভেতর থেকে সে দেখা দিয়েছিল, আবার কুয়াশার মধ্যেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমরা চারজনে অনেকক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। সূর্য অনেকখানি উঠে পড়ল আকাশে, চারদিক ভরে গেল সকালের আলোয়, ঝকমক করে জ্বলতে লাগল কাঞ্চনজঙ্ঘা। একটার-পর-একটা গাড়ি নেমে যেতে লাগল দার্জিলিঙের দিকে। সেই রহস্যময় লোকটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে! টেনিদা বললে–স্ট্রেঞ্জ!

আমি বললুম রীতিমতো গোয়েন্দা কাহিনী! হেমেন্দ্রকুমারের উপন্যাসের চেয়েও রহস্যময়।

হাবুল সেন কান-টান চুলকে বললে–আমার মনে হয় এই সমস্ত ভূতের কাণ্ড।

ক্যাবলাটাই আমাদের ভেতর সব চাইতে মাথা ঠাণ্ডা এবং আগে ঝর্ণিপাহাড়িতে কিংবা ডুয়ার্সের জঙ্গলে সব সময়েই দেখেছি ও কিছুতেই ঘাবড়ায় না। ক্যাবলা বললে–ভূত হোক কিংবা পাগলই হোক, সুবিধে পেলেই ওর সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে। কিন্তু এখন ওসব ভেবে লাভ নেই, চলো, বেশ করে চা খাওয়া যাক।

চা-টা খেয়ে বেরিয়ে আমরা কেভেন্টারের ডেয়ারি দেখতে গেলুম। সেখানে পেল্লায় পেল্লায় গোরু আর ঘাড়ে-গদানে ঠাসা মোটা শুয়োর। শুয়োর দেখলেই আমার গবেষণা করতে ইচ্ছা হয়। কেমন মনে হয় ছুঁচো আর শুয়োর পিসতুতো ভাই। একটা ছুঁচোর ল্যাজ একটু কেটে দিয়ে বেশ করে ভিটামিন খাওয়ালে সেটা নির্ঘাত একটা পুরুষ্টু শুয়োরে দাঁড়িয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। প্রায়ই ভাবি, ডাক্তার মেজদাকে একটু জিগগেস করে দেখব। কিন্তু মেজদার যা খিটখিটে মেজাজ, তাকে জিগগেস করতে ভরসা হয় না। আচ্ছা, মেজাজওয়ালা দাদাই কি সংক্ষেপে মেজদা হয়? কে জানে!

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলুম সিঞ্চল লেক দেখতে—লেক মানে কলকাতার লেক নয়, চিল্কাও নয়। দুটো মস্ত চৌবাচ্চায় ঝরনার জল ধরে রেখেছে, আর তাই পাইপে করে দার্জিলিঙের কলে পাঠিয়ে দেয়। দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল।

কিন্তু জায়গাটি বেশ। চারিদিকে বন, খুব নিরিবিলি। বসবার ব্যবস্থাও আছে এখানে-ওখানে। ভোরবেলায় গানটা গাইবার সময় বাধা পড়তে মনটা খারাপ হয়েই ছিল, ভাবলুম এখানে নিরিবিলিতে একটুগলা সেধে নিই।

ওরা তিনজন দেখছিল, কী করে জল পাম্প করে তোলে। আমি একা একটা বাঁধানো জায়গাতে গিয়ে বসলুম। তারপর বেশ গলা ছেড়ে ধরলুম—

খর বায়ু বয় বেগে, চারদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো—

ঠিক তক্ষুনি পেছন থেকে কে বললে—শাবাশ।

তাকিয়ে দেখি বনের রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক উঠে এসেছেন। মাথায় একটা বাঁদুরে রঙের কান ঢাকা টুপি, চোখে নীল চশমা, হাতে মোটা লাঠি, মুখে পাকা গোঁফ।

সূচিপত্র

ভদ্রলোক বললেন—বেশ গাইছ তো! তোমার অরিজিনালিটি আছে। মানে গানটা রবিঠাকুরের হলেও বেশ নিজের মতো সুর দিয়েছ।

চটব, না খুশি হব বুঝতে পারলুম না।

ভদ্রলোক বললেন—তোমার মতো প্রতিভাবান ছেলেই আমার দরকার। যাবে আমার সঙ্গে?

অবাক হয়ে আমি বললুম-কোথায়?

ভদ্রলোক হেসে বললেন-নীলপাহাড়ি।

সেই নীলপাহাড়ি! আমি বিষম খেলুম একটা।

ভদ্রলোক হেসেই বললেন কী আছে দার্জিলিঙে? কিছু না। ভিড়—ভিড়-ভিড়। শুধু ম্যালে বসে হাঁ করে থাকা, নয় খামকা ঘোড়া দাবড়ানো আর নইলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে একবার টাইগার হিল দেখে আসা। কোনও মানে হয় ও-সবের! চলো নীলপাহাড়িতে। দেখবে, কী আশ্চর্য জায়গা কী ফুলকী অপূর্ব রহস্য! আমি সেইখানেই থাকি। সেখানকার ঝাউ বাংলোয়।

ঝাউবাংলো! আমি আবার খাবি খেলুম।

তখন ভদ্রলোক একটানে বাঁদুরে টুপিটা খুলে ফেললেন। টুপির আড়ালে একমুখ দাড়ি। কিন্তু আসল রহস্য সেখানে নয়, আমি দেখলুম তাঁর দাড়ির রং সবুজ। একেবারে ঘন সবুজ।

একবার হাঁ করেই মুখটা বন্ধ করলুম আমি। আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল লাটুর মতো বনবনিয়ে।

ফরমুলা বনাম কাগামাছি

আমার মাথাটা সেই-যে বনবনিয়ে লাটুর মতো ঘুরতেলাগল, তাতে মনে হল, সারা সিঞ্চল পাহাড়টাতেই আর গাছগাছালি কিছু নেই, সব সবুজ রঙের দাড়ি হয়ে গেছে। আর সেই দাড়িগুলো আমার চারপাশে বোঁ বোঁ করে পাক খাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে উঠেছিলুম, সঙ্গে সঙ্গেই ধপাস করে বাঁধানো বেঞ্চিটায় বসে পড়তে হল।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন কী হল খোকা?

আমি উত্তরে বললুম—ওফ।

—ওফ, মানে? ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন ব্যাপার কী হে? পেট কামড়াচ্ছে? ফিক ব্যথা উঠেছে? নাকি মৃগী আছে তোমার? এইটুকু বয়সেই এইসব রোগ তো ভালো নয়।

মাথাটা একটু একটু সাফ হচ্ছে, আমি কিছু একটা বলতে গেলুম। তার আগেই তিনমূর্তি—টেনিদা, ক্যাবলা, আর হাবুল সেন এসে পৌঁছেছে। আর বুড়ো ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়েই হাবুল সেন খাইছে বলে দুহাত লাফিয়ে সরে গেল। ক্যাবলার চোখ দুটো ঠিক আলুর চপের মতো বড় বড় হয়ে উঠল। আর টেনিদা বলে ফেলল—ডিলা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস!

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে চারদিক তাকালেন। বললেন কী হয়েছে বলো দেখি? তোমরা সবাই আমাকে দেখে অমন ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? আর ওই যে কী বললে-ডিলা মেফিস্টোফিলিস—ওরই বা মানে কী? টেনিদা বললে—ওটা ফরাসী ভাষা।

ফরাসী ভাষা! ভদ্রলোক তার সবুজ দাড়ি বেশ করে চুমরে নিয়ে বললেন আমি দশ বছর ফ্রান্সে ছিলুম, এরকম ফরাসী ভাষা তো কখনও শুনিনি। আর

মেফিস্টোফিলিস মানে তো শয়তান! তোমরা আমাকে বুড়ো মানুষ পেয়ে খামকা গালাগালি দিচ্ছ নাকি হে?

এবার মনে হল, ভদ্রলোক রীতিমতো চটেই গেছেন।

আমাদের ভেতর ক্যাবলাই সবচাইতে চালাক আর চটপটে, ও কিছুতেই কখনও ঘাবড়ে যায়। ও-ই সাহস করে ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে এল। বলল—আজ্ঞে আপনার দাড়িটা..

-কী হয়েছে দাড়িতে?

—মানে সবুজ দাড়ি আমরা কেউ কখনও দেখিনি কিনা, তাই-

–ওঃ এই কথা—ভদ্রলোক এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন আর আমরা দেখতে পেলুম ওঁর সামনের পাটিতে একটা দাঁত নেই, আর একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওঁর নাক দিয়ে ফোঁতফোঁত আওয়াজ হল।

বেশ খানিকটা সোনালি দাঁতের ঝিলিক আর ফোকলা দাঁতের ফাঁক দেখিয়ে হাসি থামালেন। তারপর বললেন—ওটা আমার শখ। আমি একজন প্রকৃতি-প্রেমিক, মানে বন-জঙ্গল গাছপালা এইসব নিয়ে পড়ে থাকি। একটা বইও লিখছি গাছ-টাছ নিয়ে। তাই শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দ মেলাবার জন্যে দাড়িটাকেও সবুজ রঙে রাঙিয়ে নিয়েছি। বুঝতে পারলে?

টেনিদা হঠাৎ ফস করে জিগগেস করলে আপনি কবিতা লেখেন স্যার?

হাবুল বললে-হ-হ, আপনি পদ্য লিখতে পারেন?

—পদ্য? কবিতা?—ভদ্রলোকের মুখখানা আবার আহ্লাদে ভরে উঠল—তা লিখেছি বই কি এককালে। তোমাদের তখন জন্ম হয়নি। তখন কত কবিতা মাসিকপত্রে

বেরিয়েছে আমার। এখন অবিশ্যি ছেড়েছুড়ে দিয়েছি। কিন্তু মগজে ভাব চাগিয়ে উঠলে মাঝে-মাঝে দুটো-চারটে বেরিয়ে আসে বই কি। এই তো সেদিন রাত্তিরে চাঁদ উঠেছে, পাইনগাছের মাথাগুলো ঝলমল করছে, আর আমি বসে বসে একটা ইংরেজী প্রবন্ধ লিখছি। হঠাৎ সব কী রকম হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি আমার কলমটা যেন আপনিই তরতর করে কবিতা লিখে চলেছে। কী লিখেছিলুম একটু শোনো–

ওগো চাঁদিনী রাতের পাইন–
ঝলমল করছে জ্যোৎস্না
দেখাচ্ছে কী ফাইন!
ঝিরঝির করে ঝরনা ঝরছে
প্রাণের ভেতর কেমন করছে
ভাবগুলো সব দাপিয়ে মরছে
ভাঙছে ছন্দের আইন–
ওগো পাইন।

–কী রকম লাগল?

আমরা সমস্বরে বললুম–ফাইন! ফাইন।

ভদ্রলোক আর একবার দাড়িটা চুমরে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আরও কোনও কবিতা বোধহয় তাঁর মাথায় আসছিল। কিন্তু ক্যাবলা ফস করে জিগগেস করলে আপনি মুণ্ডু নাচাতে পারেন?

–মুণ্ডু নাচাব? কার মুণ্ডু নাচাতে যাব আবার?

টেনিদা জিগগেস করলে–আপনি কুণ্ডুমশাই বুঝি?

–কুণ্ডুমশাই? আমার চৌদ্দপুরুষেও কেউ কুণ্ডুমশাই নেই। আমার নাম সাতকড়ি সাঁতরা। আমার বাবার নাম পাঁচকড়ি সাঁতরা। আমার ঠাকুর্দার নাম–

হাবুল বলে ফেলল–তিনকড়ি সাঁতরা।

সাতকড়ি অবাক হয়ে গেলেন–তুমি জানলে কী করে?

–দুইটা কইর‍্যা সংখ্যা বাদ দিতে আছেন কিনা, তাই হিসাব কইর‍্যা দেখলাম। আপনের ঠাকুদার বাবার নাম হইব এককড়ি সাঁতরা। তেনার বাবার নাম যে কী হইব–হিসাবে পাইতেছি না; মাইনাস দিয়া করন লাগব মনে হয়।

শাবাশ-শাবাশ!–সাতকড়ি সাঁতরা হাবুলের পিঠটা বেশ ভালো করে থাবড়ে দিলেন।–তোমার তো খুব বুদ্ধি আছে দেখছি। কিন্তু আমার ঠাকুর্দার কথা ভেবে আর মন খারাপ কোরো না–তাঁর নাম আমারও জানা নেই। যাই হোক, ভারি খুশি হলুম। আমি তোমাদের চারজনকেই ঝাউবাংলোয় নিয়ে যাব।

–ঝাউবাংলো!–ওরা তিনজনেই এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

–আহা! সেই কথাই তো বলছিলুম তোমার এই বন্ধুকে। আহা, কী জায়গা! দার্জিলিঙের মতো ভিড় নেই, চেঁচামেচি নেই, নোংরাও নেই। পাইন আর ঝাউয়ের বন। তার ভেতর দিয়ে সারি সারি ঝরনা নামছে। কত ফুল ফুটেছে এখন। শানাই, হাইড্রেনজিয়া, ফরগেট-মি-নট, রডোডেনড্রন এখন লালে লাল। আর আর তার মাঝে আমার বাংলো।

সাতকড়ি যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতো সুর টেনে চললেন–তিনদিন যদি ওখানে থাকো, তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা নিরেট বেরসিক, তারাও তরতর করে কবিতা লিখতে শুরু করে দেবে।

–কিন্তু তার আগে যদি ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তীর ছড়াটার মানে বোঝা যেত–

সাতকড়ি বললেন কী বললে-? ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তীর ছড়া? কী বিটকেল নাম! ও-নামে কেউ আবার ছড়া লেখে নাকি?

–আজ্ঞে লেখে, তাও আবার আপনার ঝাউবাংলোকে নিয়ে।

—অ্যাঁ।

–তাতে আপনার সবুজ দাড়ির কথাও আছে।

–বটে! লোকটার নামে আমি মানহানির মামলা করব।

টেনিদা বললে–তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়? সেই মিচকেপটাশ লোকটা এক-একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। সে বলেছে, আপনার ঝাউবাংলোয় নাকি হাঁড়িচাঁচায় গান গায়।

সাতকড়ি চটে গেলেন—হাঁড়িচাঁচায় গান গায়? নীলপাহাড়িতে হাঁড়িচাঁচা কোত্থেকে আসবে? ও বুঝেছি। আমি মধ্যে-মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে থাকি বটে। তার নাম হাঁড়িচাঁচার গান? লোকটাকে আমি জেলে দেব।

—আরও বলেছে, সেখানে কুণ্ডুমশায় মুণ্ডু নাচায়।

—স্রেফ বাজে কথা। সেখানে কুণ্ডুমশায় বলে কেউ নেই। আমি আছি আর আছে আমার চাকর কাঞ্ছা। নিজের মুণ্ডু নাচানো আমি একদম পছন্দ করি না। কাঞ্ছাও করে বলে মনে হয় না আমার।

ক্যাবলা বললে–শুধু তাই নয়। আপনি বলার আগে সে-ই আমাদের ঝাউবাংলোয় নেমন্তন্ন করেছে।

—আমার বাড়িতে মিচকে আর ফচকে লোক তোমাদের নেমন্তন্ন করে বসেছে? আচ্ছা ফেরেব্বাজ তো। লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত!

হাবুল বললে-তারে আপনি পাইবেন কই?

তখন সাতকড়ি সাঁতরা মিনিটখানেক খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ সেই বেঞ্চিটায় বসে পড়লেন। আর ভীষণ করুণ সুরে বললেন, বুঝেছি, সব বুঝতে পেরেছি এইবার।

আমরা চারজনে চেঁচিয়ে উঠলুম!-কী বুঝেছেন?

—এ সেই কদম্ব পাকড়াশির কাণ্ড।

—কে কদম্ব পাকড়াশি?

-আমার চিরশত্রু। যখন কবিতা লিখেছি, তখন কাগজে কাগজে আমার কবিতার নিন্দে করত! এখন সে বিখ্যাত জামানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছির গুপ্তচর। আমার নতুন আবিষ্কৃত ফরমুলাগুলো সে লোপাট করে নিতে চায়। আমি বুঝতে পারছি ঝাউবাংলোর এক দারুণ দুর্দিন আসছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রক্তপাত। ওফ!

এক দারুণ রহস্যের সন্ধান পেয়ে আমরা চারজনে শিউরে উঠলুম। হাবুল সেন তো সঙ্গে-সঙ্গে এক চিৎকার ছাড়ল। টেনিদার মুখের দিকে দেখি, ওর মৈনাকের মতো লম্বা নাকটা কীরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, ঠিক একটা সিঙাড়ার মতো দেখাচ্ছে এখন। খানিকক্ষণ মাথা-টাথা চুলকে বললে-চুরি-ডাকাতি-হত্যা-রক্তপাত! এ যে ভীষণ কাণ্ড মশাই। পুলিশে খবর দিন।

পুলিশ! পৃথিবীর সবকটা মহাদেশের পুলিশ দশ বছর চেষ্টা করেও কাগামাছির টিকিটি ছুঁতে পারেনি। অবশ্যি কাগামাছির কোনও টিকি নেই-তার মাথা-জোড়া সবটাই টাক। নানা ছদ্মবেশে সে ঘুরে বেড়ায়। কখনও তিব্বতী লামা, কখনও

মাড়োয়ারি বিজনেসম্যান, কখনও রাত্তিরবেলা কলকাতার গলিতে দুমুখো আলো হাতে মুশকিল আসান। পৃথিবীর সব ভাষায় কাগামাছি কথা কইতে পারে। শুধু তাই? একবার সে এক কাঁটাবনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, এমন সময় সেদিকে পুলিশ এসে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। ধরে ফেলে—এমন অবস্থা। তখন সেই ঝোপের মধ্য থেকে পাগলা শেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক আওয়াজ করতে লাগল। পুলিশ ভাবল, কামড়ালেই জলাতঙ্ক-তারা পালিয়ে বাঁচল সেখান থেকে।

—তা হলে আপনি বলছেন সেই মিচকে চেহারার ফচকে লোকটাই কাগামাছি?আমি জানতে চাইলুম।

-না, ওটা কদম্ব পাকড়াশি। ওর মুখে একজোড়া সরু গোঁফ ছিল?

—ছিল। হাবুল পত্রপাঠ জবাব দিলে।

-আর গলায় একটা রোঁয়া-ওঠা মেটে রঙের ধুসো কম্ফর্টার?

—তাও ছিল।-এবার ক্যাবলাই সাতকড়িবাবুকে আলোকিত করল।

—তবে আর সন্দেহ নেই। ওই হচ্ছে সেই বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো হাড়-হাবাতে রাম-ফড় কদম্ব পাকড়াশি।

-তা হঠাৎ আপনার ওপরে ওদের নজর পড়ল কেন?—টেনিদা আবার জিগগেস করল।

হাবুল বললে-আহা শোন নাই? ওনার কী য্যান্ মুলার উপর তারগো চক্ষু পড়ছে।

টেনিদা বললে-মুলো? মুলোর জন্য এত কাণ্ড? আমাদের শেয়ালদা বাজারে পয়সায় তো একটা করে মুলো পাওয়া যায়। তার জন্যে চুরি-ডাকাতি-রক্তপাত? কী যে বলেন স্যার কোনও মানে হয় না।

সাতকড়ি সাঁতরা বিষম ব্যাজার হয়ে বললেন—মুলো কে বলেছে? মুলো আমার একদম খেতে ভালো লাগে না, খেলেই চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। আমি বলছিলুম ফরমুলা।

হাবুল বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে-অ-ফরমুলা! তা ফরমুলার কথা ক্যাবলারে কন। আমাদের মধ্যে ও-ই হইল অঙ্কে ভালো—সব বুঝতে পারব।

—তোমরাও বুঝতে পারবে! আমি গাছপালা নিয়ে রিসার্চ করতে করতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার করে বসেছি। অর্থাৎ একই গাছে এক সঙ্গে আমকাঁঠালকলা-আনারস-আপেল আর আঙুর ফলবে। আর বারো মাসেই ফলবে।

-তাই নাকি?—শুনে তো আমরা থ।

—সেইজন্যেই।-সাতকড়ি সাঁতরা বিষণ্নভাবে মাথা নাড়লেন।—সেইজন্যেই এই চক্রান্ত! ওহহ হহ! আমার কী হবে?

কিন্তু কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাবলাকে একটু সন্দিগ্ধ মনে হল। ফরমুলা চুরি করতে হলে সেটা তো চুপি চুপি করাই ভালো। সেজন্য পথেঘাটে এমন করে ছড়ার ছড়াছড়ি করার কী মানে হয়? সবই তো জানাজানি হয়ে যাবে।

—ওই তো কাগামাছির নিয়ম। গোড়া থেকেই এইভাবে সে রহস্যের খাসমহল তৈরি করে নেয়। বলতে-বলতে সাতকড়ি সাঁতরা প্রায় কেঁদে ফেললেন।—এই বিপদে তোমরা আমায় বাঁচাবে না? তোমরা এ-যুগের ইয়ংম্যান। এই দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে না আমার?

এমন করুণ করে বললেন যে, আমারই বুকের ভেতরটা আ-আ-হা করতে লাগল। আর ফস করে টেনিদা বলে ফেলল—নিশ্চয় করব, আলবাত করব।

-কথা রইল।

www.bengaliebook.com

–কথা রইল।

–বাঁচালে। বলে সাতকড়ি সাঁতরা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন–তা হলে আজ বিকেল সাড়ে-চারটেয় দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। ন্যাচারাল মিউজিয়মের ওপরে যে-পার্কটা আছে সেখানে!

আর বলেই সুট করে কাঠবেড়ালির মতো পাশের বনটার ভেতর তাঁর সবুজ দাড়ি, ওভারকোট আর হাতের লাঠিটা নিয়ে ঠিক সেই মিচকেপটাশ কদম্ব পাকড়াশির মতোই হাওয়া হয়ে গেলেন তিনি।

চকোলেট নাম্বার টু

সবুজ দাড়ি, বাঁদুরে টুপি, নীল চশমা আর ধুসো ওভারকোট-পরা সাতকড়ি সাঁতরা তো সাঁ করে সিঞ্চলের সেই বনের মধ্যে টুপ করে ডুব মারলেন। আর কলকাতার কাকেরা যেমন হাঁ করে বসে থাকে, তেমনি করে আমরা চারজন এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। শেষে হাবুল সেনই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। একটা খুদে পাহাড়ি মৌমাছি ওর কান তাক করে এগিয়ে আসছিল দেখে তিন পা নেচে নিয়ে মৌমাছিটাকে তাড়িয়ে দিলে।

হাবুল বললে- কাণ্ডটা কী হইল টেনিদা? টেনিদার মাথায় কোনও গভীর চিন্তা এলেই সে ফরাসী ভাষা শুরু করে। বললে- –ডি-লুক্স!

আমি বললুম-তার মানে?

টেনিদা আবার ফরাসী ভাষায় বললে–পুঁদিচ্চেরি!

ক্যাবলা বললে–পুঁদিচ্চেরি? সে তো পণ্ডিচেরি! এর সঙ্গে পণ্ডিচেরির কী সম্পর্ক?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে-থাম থাম। পণ্ডিচেরি! খুব যে পণ্ডিতি ফলাতে এসেছিস। ফরাসী ভাষায় পুঁদিচ্চেরি মানে হল,ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো।

ক্যাবলা প্রবল প্রতিবাদ করে বললে- কক্ষনো না। আমার পিসেমশাই পণ্ডিচেরিতে ডাক্তারি করতেন। আমি জানি।

-জানিস?

—জানি।

টেনিদা খটাং করে তক্ষুনি ক্যাবলার চাঁদিতে একটা গাঁট্টা মারল। ক্যাবলা উ-হু-হু করে বাগদা চিংড়ির মতো ছটকে গেল টেনিদার সামনে থেকে।

—এখনও বল, জানিস?বাঘাটে গলায় টেনিদার প্রশ্ন।

-না, জানিনে। ক্যাবলা চাঁদিতে হাত বুলোত লাগল—যা জানতুম তা ভুলে গেছি। তোমার কথাই ঠিক। পুঁদিচ্চেরি মানে ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক। আর কত যে সাংঘাতিক, নিজের মাথাতেই টের পাচ্ছি সেটা।

টেনিদা খুশি হয়ে বললে-অল রাইট। বুঝলি ক্যাবলা, ইস্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পেয়ে তোর ভারি ডেপপামি হয়েছে। আবার যদি কুরুবকের মতো বকবক করিস তাহলে এক চড়ে তোর কান

হাবুল বললে-কানপুরে উইড়া যাইব।

-কারেক্ট! এইজন্যেই তো বলি, হাবলাই হচ্ছে আমার ফাস্ট অ্যাঁসিসট্যান্ট। সে যাক। এখন কী করা যায় বল দিকি? এই সবুজদেড়ে লোকটা তো মহা ফ্যাচাঙে ফেলে দিলে।

ক্যাবলা বললে-আমরা কথা দিয়েছে ওকে হেলপ করব।

–তারপর যদি সেই জাপানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছি এসে আমাদের ঘাড়ে চড়াও হয়?

আমি বললুম–তাকে মাছির মতোই সাবাড় করে ফেলব!

–কে সাবাড় করবে, তুইটেনিদা আমার দিকে তাকিয়ে নাক-টাক কুঁচকে, মুখটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে–ওই পুঁটি-মাছের মতো চেহারা নিয়ে। তোকে ওই কাগামাছি আর কদম্ব পাকড়াশি স্রেফ ভেজে খেয়ে ফেলবে, দেখে নিস।

হাবুল সেন বললে–এখন ওইসব কথা ছাড়ান দাও। আইজ বৈকালেই তো বুইড়ার লগে দেখা হইব! তখন দেখা যাইব, কী করন যায়! অখন ফিরা চল, বড়ই ক্ষুধা পাইছে।

টেনিদা দাঁত খেচিয়ে কী যে বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা গগনভেদী চিৎকার। আমাদের সংস্কৃতের প্রফেসার যাকে বলেন জীমূতমন্দ্র কিংবা অম্বরে ডম্বরু–অনেকটা সেই রকম।

আর কে? সেই যে বেরসিক নেপালী ড্রাইভার আমার গানে বাগড়া দিয়েছিল। ড্রাইভার এতক্ষণ নীচে গাড়ি নিয়ে বসেছিল, এইবার অধৈর্য হয়ে পাহাড় ভেঙে উঠে এসেছে ওপরে।

–আপনাদের মতলব কী স্যার। সারাটা দিন সিঞ্চলেই কাটাতে চান নাকি। তা হলে ভাড়া মিটিয়ে আমায় ছেড়ে দিন, আমি দার্জিলিঙে চলে যাই।

টেনিদা বললে–আর আমরা ফিরে যাব কী করে!

–হেঁটে ঘুমে যাবেন, সেখান থেকে ট্রেন ধরবেন। পরিষ্কার বাংলায় সাফ গলায় জানিয়ে দিলে ড্রাইভার।

আমি বললুম-থাক আর উপদেশ দিতে হবে না। আমরা যাচ্ছি।

www.bengaliebook.com

আমরা চারজনে গুম হয়ে এসে গাড়িতে বসলুম! মাথার ভেতরে সাতকড়ি সাঁতরা, এক গাছে চার রকম ফল ফলানোর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জাপানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছি আর ধড়িবাজ কদম্ব পাকড়াশি, এই সবই ঘুরপাক খাচ্ছে তখন। বনের পথ দিয়ে এঁকেবেঁকে আমাদের ল্যান্ড রোভার নেমে চলেছে।

আমি বজ্রবাহাদুরের পাশে বসেছিলুম। হঠাৎ ডেকে জিগগেস করলুম—আচ্ছা ড্রাইভার সাহেব-

—আমি ড্রাইভার নই, গাড়ির মালিক। আমার নাম বজ্রবাহাদুর।

—আচ্ছা বজ্রবাহাদুর সিং—

—সিং নয়, থাপা।

তার মানে শিংওলা নিরীহ প্রাণী নয়, দস্তুরমত থাবা আছে। মেজাজ আর গলার স্বরেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। আমি সামলে নিয়ে বললুম—আপনি নীলপাহাড়ি চেনেন?

বজ্রবাহাদুর বললে-চিনব না কেন? সে তো পুবং-এর কাছেই। আর পুবং-এই তো আমার ঘর।

-তাই নাকি! এবর ক্যাবলা আকৃষ্ট হল—আপনি সেখানকার ঝাউবাংলো দেখেছেন?

—দেখেছি বই কি। ম্যাকেঞ্জি বলে একটা বুড়া সাহেব তৈয়ার করেছিল সেটা। তারপর হিন্দুস্থান স্বাধীন হল আর বুড়া সেটাকে বেচে দিয়ে বিলায়েত চলে গেল। এখন কলকাতার এক বাঙালী বাবু তার মালিক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম-কেমন বাড়ি?

বজ্রবাহাদুর বললে–রামরো ছ।

–রামরো ছহাবুল বললে–অঃ বুঝছি। সেইখানেই বোধ হয় ছয়বার রাম রাম কইতে হয়।

বজ্রবাহাদুরের গোমড়া মুখে এবার একটু হাসি ফুটল–না-না, রাম রাম বলতে হয় না, রামরো ছ হল নেপালী ভাষা। ওর মানে, ভালো আছে। খুব খাসা কুঠি।

ক্যাবলা জিগগেস করলেওখানে কে থাকে এখন? কলকাতার সেই বাঙালী বাবু?

–সে আমি জানি না।

–আমরা যদি ওখানে বেড়াতে যাই, কেমন হয়?

বজ্রবাহাদুর আবার বললে– রামরো। আমার গাড়িতে যাবেন, সস্তায় নিয়ে যাব আর পুং-এর খাঁটি দুধ আর মাখনের বন্দোবস্ত করে দেব।

আমরা যখন স্যানিটরিয়ামে ফিরে এলুম, তখন খাবার ঘণ্টা পড়ো-পড়ো। তাড়াতাড়ি চান-টান সেরে খেয়ে-দেয়ে নিয়ে ফোয়ারাটার পাশে এসে আমরা কনফারেন্স বসালুম।

–কী করা যায়।

টেনিদা গোটা চল্লিশেক লিচু নিয়ে বসেছিল, খাওয়ার পর ওইটেই তার মুখশুদ্ধি। একটা লিচু টপাৎ করে গালে ফেলে বললে–চুলোয় যাক, আমরা ওসবের ভেতর নেই। দুদিনের জন্যে দার্জিলিঙে বেড়াতে এসেছি, খামকা ও-সব ঝাট কে পোয়াতে যায় বাপু! ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে, দিব্যি ওজন বাড়িয়ে ফিরে যাব–ব্যস!

ক্যাবলা বললে- ভদ্রলোককে সকালে যে কথা দেওয়া হল?

লিচুর আঁটিটা সামনের পাইনগাছে একটা কাককে তাক করে ছুড়ে দিলে টেনিদা –বিকেলে সেকথা ফিরিয়ে নিলেই হল? সবুজ দাড়ি, কাগামাছি! হুঃ। যত সব বোগাস। আমি বললুম-কিন্তু বজ্রবাহাদুর বলছিল, পুবং থেকে খাঁটি দুধ আর মাখন খাওয়াবে।

টেনিদা আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে-ধুৎ। এটার রাতদিন খাইখাই–এই করেই মরবে। দুধ-মাখনের লোভে কাগামাছির খপ্পরে গিয়ে পড়ি, আর সে আমাদের আরশোলার চাটনি বানিয়ে ফেলুক! বলেই আর একটা লিচু গালে পুরে দিলে।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে-হ, সেই কথাই ভালো। ঝামেলার মইধ্যে গিয়া কাম নাই।

তখন আমি বললুম-তা হলে, থাক। সাতকড়ি সাঁতরাকে দেখে আমারও কেমন সন্দেহজনক মনে হল। কেমন ঝাঁ করে বনের ভেতর লুকিয়ে গেল–দেখলে না!

হাবুল বলল–আমার তো ভূত বইলাই মনে হইতাছে।

ক্যাবলা ভীষণ চটে গেল–দুত্তোর! দিন-দুপুরে সিঞ্চল থেকে ভূতের আসতে বয়ে গেছে। আসল কথা, তোমরা সবাই হচ্ছ পয়লা নম্বরের কাওয়ার্ড হিন্দীতে যাকে বলে একদম ডরপোক!

কী বললি! কাওয়ার্ড!-টেনিদা হুংকার ছাড়ল। খুব সম্ভব ক্যাবলাকে একটা চাঁটি কষাতে যাচ্ছিল, এমন সময় স্যানিটারিয়ামের এক কাঞ্ছা এসে হাজির। তার হাতে একটা ছোট প্যাকেট।

এসেই বললে-তিমিরো লাই।

টেনিদা বললে–তার মানে? তিমিরো লাই? এই দুপুর বেলা তিমির কোথায় পাব? আর লাই মানে তো শোয়া। খামকা শুতেই যা যাব কেন?

ক্যাবলা হেসে বলল–না-না-বলছে, তোমাদের জন্যে।

তাই নাকি?-টেনিদা একটানে প্যাকেট নিয়ে খুলে ফেলল। আর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মস্ত চকোলেট।

—চকোলেট? কে দিলে?

কাঞ্ছা আবার নেপালী ভাষায় জানালে একটু আগেই সে মাথি অর্থাৎ উপরে বাজারে গিয়েছিল। সেখানে সরু গোঁফ আর গলায় মেটে রঙের মাফলার জড়ানো একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে তার হাতে এইটে দিয়ে বলে, কলকাতা থেকে যে-চারজন ছোকরা বাবু এসেছে তাদের কাছে যেন পৌঁছে দেয়।

সরু গোঁফ, মেটে রঙের মাফলার! তা হলে–

টেনিদা একটানে চকোলেটটা খুলে ফেলল। টুপ করে মাটিতে পড়ল চার ভাঁজ করা একটি চিরকুট। তাতে লেখা :

যাচ্ছ না তো নীলপাহাড়ি!
অকর্মা সব ধাড়ি ধাড়ি!
এতেই প্রাণে লাগল ত্রাস
গড়ের মাঠে খাওগে ঘাস।

হাবুল সুর করে কবিতাটা পড়ল। আর আমরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম–কদম্ব পাকড়াশি!

কিছুক্ষণ চুপচাপ! টেনিদা গম্ভীর! একটা লিচু ছাড়িয়ে মুখের কাছে সেই থেকে ধরে রয়েছে, কিন্তু খাচ্ছে না। টেনিদার এমন আশ্চর্য সংযম এর আগে আমি কোনওদিন দেখিনি।

ক্যাবলা বলল–টেনিদা, এবার?

টেনিদার নাকের ভেতর থেকে আওয়াজ বেরুল-হুম!

–আমাদের অকর্মার ধাড়ি বলেছে : গড়ের মাঠে গিয়ে ঘাস খাবার উপদেশ দিয়েছে।

হাবুল সেন বললে–হ, শত্রুকে চ্যালেঞ্জ কইরা পাঠাইছে।

ক্যাবলা আবার বললে– কদম্ব পাকড়াশির কাছে হার মেনে কলকাতায় ফিরে যাবে টেনিদা? গিয়ে গড়ের মাঠে ঘাস খাবে?

টেনিদা এবারে চিৎকার করে উঠলকভি নেই। নীলপাহাড়িতে যাবই।

–আলবাত?

–আলবাত বলেই টপাৎ করে লিচুটা মুখে পুরে দিলে। আমার মনটা চকোলেটের জন্য ছোঁক ছোঁক করছিল, বললুম–তা হলে কদম্ব পাকড়াশির চকোলেটটা ভাগযোগ করে–

টেনিদা সংক্ষেপে বললে, শাট আপ।

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা গিয়ে হাজির হলুম ন্যাচারাল মিউজিয়ামের কাছে পার্কটায়।

যারা বেড়াতে বেরিয়েছে, সবাই গিয়ে ভিড় করেছে ম্যালে। সামনে দিয়ে টকাটক করে ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে বার্চহিলের দিকে। প্রায় ফাঁকা পার্কে আমরা চারজন ঘুঘুর মতো একটা বেঞ্চিতে অপেক্ষা করে আছি। এখানেই সেই সবুজ দাড়িওলা সাতকড়ি সাঁতরার আসবার কথা।

দশ-পনেরো-বিশ মিনিট কাটল, বসে আছি তো বসেই আছি। চার আনার চীনেবাদাম শেষ হয়ে পায়ের কাছে ভাঙা খোলার একটা পাহাড় জমেছে। সাতকড়ির আর দেখা নেই।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বলল–কই রে ক্যাবলা, সেই সবুজদাড়ি গেল কোথায়?

হাবুল বললে-কইলাম না, ওইটা সিঞ্চল পাহাড়ের ভূত। বনের ভূত বনে গেছে, এইখানে আর আইব না।

ক্যাবলা বললে- ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একটু দেখাই যাক না। আমার মনে হয় ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আসবেন!

ঠিক তখন পেছন থেকে কে বললে–এই তো এসে গেছি।

আমরা চমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। পার্কে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। তার ওপর বেশ করে কুয়াশা ঘনিয়েছে। এই পার্কটা যেন চারদিকের পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গেছে এখন। আর এরই মধ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই লোকটা। মাথায় বাঁদুরে টুপি, চোখে নীল চশমা।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ঠোঁটে আঙুল দিলেন।

–স–সস্। আশেপাশে কাগামাছির চর ঘুরছে। কাজের কথা সংক্ষেপে বলে নিই। তোমরা নীলপাহাড়িতে যাচ্ছ তো?

টেনিদা বললে, যাচ্ছি।

–কাল সকালে?

ভদ্রলোক এবার চাপা গলায় বললেন–ঠিক আছে। মোটর ভাড়া করে চলে যেয়ো, ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। ওখানে গিয়ে পাহাড়ি বস্তিতে জিগগেস করলেই ঝাউবাংলো চিনিয়ে দেবে এখন। আর তোমরা আমার গেস্ট হবে। মোটর ভাড়াও আমি দিয়ে দেব এখন। রাজি?

হাবুল বললে–হ, রাজি।

–তা হলে আমি চলি। দাঁড়াবার সময় নেই। কালই ঝাউ-বাংলোয় দেখা হবে। আর একটা কথা মনে রেখো। ছুঁচোবাজি।

—ছুঁচোবাজি? আমি আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করলুম–ছুঁচোবাজি আবার কী?

–কাগামাছির সংকেত! আচ্ছা চলি। টা-টা–

বলেই ভদ্রলোক ঝাঁ করে চলে গেলেন, কুয়াশার ভেতর দিয়ে কোন্ দিকে যে গেলেন ভালো করে ঠাহরও পাওয়া গেল না।

ক্যাবলা উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গেই।

–চলো টেনিদা।

–কোথায়?

মোটর স্ট্যান্ডে। বজ্রবাহাদুরের গাড়িটা ঠিক করতে হবে।

www.bengaliebook.com

বলতে না বলতেই ফড়ফড়ফড়-ডাং করে আওয়াজ উঠল একটা। আর হাবুলের ঠিক কানের পাশ দিয়ে একটা ছুঁচোবাজি এসে পড়ল সামনের ঘাসের উপর আগুন-ঝরিয়ে তিড়িক করে নাচতে নাচতে ফটাত্ শব্দে একটা ফরগেট-মি-নটের ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল।

ঝাউ-বাংলোয়

আমরা কজনে হাঁ করে সেই ছুঁচোবাজির নাচ দেখলাম। তারপর ঝোপের মধ্যে ঢুকে যখন সেটা ফুস করে নিবে গেল তখনও কারও মুখে একটা কথা নেই। পার্কটা তখন ফাঁকা, ঘন শাদা কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে, আশেপাশে যে আলোগুলো জ্বলে উঠেছিল, তারাও সেই কুয়াশার মধ্যে ডুব মেরেছে। আর আমরা চারজন যেন কোনও রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে বসে আছি।

টেনিদাই কথা কইল প্রথম।

–হাঁ রে, এটা কী হল বল দিকি?

হাবুল একটা চীনেবাদাম মুখে দিয়ে গিলতে গিয়ে বিষম খেল। খানিকক্ষণ খকখক করে কেশে নিয়ে বললে–এইটা আর বুঝতে পারলা না? সেই কদম্ব পাকড়াশি আমাগো পিছে লাগছে।

আমি বললুম–হয়তো বা কাগামাছি নিজেই এসে ছুঁড়ে দিয়েছে ওটা।

টেনিদা বলল–ধুত্তোর, এ তো মহা ঝামেলায় পড়া গেল! কোথায় গরমের ছুটিতে দিব্যি কদিন দার্জিলিঙে ঘুরে যাব, কোত্থেকে সেই মিচকেপটাশ লোকটা এসে হাজির হল। তারপর আবার সবুজদেড়ে সাতকড়ি সাঁতরা কী এক জাপানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছি না বগাহাঁছি ভালো লাগে এসব?

হাবুল দুঃখ করে বললে- বুঝলা না, আমাগো বরাতই খারাপ। সেইবারে ঝণ্টিপাহাড়িতে বেড়াইতে গেলাম–কোহ্মিা এক বিকট ঘুটঘুটানন্দ জুটল।

ক্যাবলা বললে-তাতে ক্ষেতিটা কী হয়েছিল শুনি? ওদের দলটাকে ধরিয়ে দিয়ে সবাই একটা করে সোনার মেডেল পাওনি?

টেনিদা মুখটাকে আলুকাবলির মতো করে বললে, আরে রেখে দে তোর সোনার মেডেল। ঘুটঘুটানন্দ তবু বাঙালী, যাহোক একটা কায়দা করা গিয়েছিল। আমি ডিটেকটিভ বইতে পড়েছি, এ-সব জাপানীরা খুব ডেঞ্জারাস হয়।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ-হ, আমিও পড়ছি সেই সব বই। আমাগো ধইরা-ধইরা পুটুত-পুটুত কইরা এক একখান ইনজেকশন দিব, আর আমরা ভাউয়া ব্যাঙের মতো চিতপটান হইয়া পইড়া থাকুম। তখন আমাগো মাথার খুলি ফুটা কইর‍্যা তার মইধ্যে বান্দরের ঘিলু ঢুকাইয়া দিব।

আমি বললুম–আর তক্ষুনি আমাদের একটা করে ল্যাজ বেরুবে, আমরা লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ব, তারপর কিচমিচ করে কচিপাতা খেয়ে বেড়াব। আর আমাদের টেনিদা–

হাবুল বলল–পালের গোদা হইব। যারে কয় গোদা বান্দর।

ধাঁই করে টেনিদা একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে হাবুলের চাঁদির ওপর। দাঁত খিঁচিয়ে বললে-গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি? আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর এগুলো সব তখন থেকে ফাজলামো করছে। অ্যাঁই–ভাউয়া ব্যাঙ মানে কী রে?

হাবুল বললে-ভাউয়া ব্যাঙ! ভাউয়া ব্যাঙেরে কয় ভাউয়া ব্যাঙ।

ক্যাবলা বিরক্ত হয়ে বলল–আরে ভেইয়া আব উস বাতচিত ছোড় দো, লেকিন টেনিদা, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

–কী সন্দেহ শুনি?

—আমার মনে হল, ওই বুড়োটাই ছুঁচোবাজি ছেড়েছে।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে চমকে উঠলাম।

—সে কী!

—আমার যেন তাই মনে হল। বুড়ো ওঠবার আগে নিজের পকেটটা হাতড়াচ্ছিল, একটা দেশলাইয়ের খড়খড়ানিও যেন শুনেছিলুম।

আমি বললুম—তবে বোধহয় ওই বুড়োটাই–

হাবুল ফস করে আমার কথাটা কেড়ে নিয়ে বললে- কাগামাছি।

টেনিদা মুখটাকে ডিমভাজার মতো করে নিয়ে বললে–তোদের মুণ্ডু। ও নিজেই যদি কাগামাছি হবে, তা হলে কাগামাছির নামে ভয় পাবে কেন? আর আমাদের ঝাউ বাংলোয় যেতে নেমন্তন্নই বা করবে কেন?

হাবুল আবার টিকটিক করে উঠল—প্যাটে ইনজেকশন দিয়া দিয়া ভাউয়া ব্যাঙ বানাইয়া দিব, সেইজন্য।

—ফের ভাউয়া ব্যাঙ! টেনিদা আবার হুঙ্কার ছাড়ল—যদি ভাউয়া ব্যাঙ-এর মানে বলতে না পারিস

—ভাউয়া ব্যাঙ-এর মানে হইল গিয়া ভাউয়া ব্যাঙ।

টেনিদা একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে হাবুলের কান পাকড়াতে যাচ্ছিল, হাবুল তিড়িং করে লাফিয়ে সরে গেল-ভাউয়া ব্যাঙ-এর মতই লাফাল খুব সম্ভব। আর ক্যাবলা দারুণ বিরক্ত হল।

–তোমরা কি বসে বসে সমানে বাজে কথাই বলবে নাকি? ঝাউবাংলোতে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে না?

টেনিদা দমে গেল।

–যেতেই হবে?

ক্যাবলা বললে-যেতেই হবে। কদম্ব পাকড়াশি দুনম্বর চকোলেট পাঠিয়ে ভিতু বলে ঠাট্টা করে গেল, ছুঁচোবাজি ছেড়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলে, সেগুলো বেমালুম হজম করে চলে যাব? আমাদের পটলডাঙার প্রেটিজ নেই একটা?

আমি আর হাবুল বললুম–আলবাত!

–ওঠো তা হলে। বজ্রবাহাদুরের গাড়িটাই ঠিক করে আসি। কাল ভোরেই তো বেরুতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভালো করে ঘুমুতে পারলুম না। রাত্তিরে মাংসটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে শরীরটা হাঁইফাই করতে লাগল। তারপর স্বপ্ন দেখলুম, একটা মস্ত কালো দাঁড়কাক আমার মাথার কাছে বসে টপটপ করে মাছি খাচ্ছে, একটা একটা করে ঠোক্কর দিচ্ছে আমার চাঁদিতে। আর ফ্যাকফ্যাক করে বুড়ো মানুষের মতো বলছে যাও না একবার নীলপাহাড়ি, তারপর কী হাঁড়ির হাল করি দেখে নিয়ো।

আঁকপাঁক করে জেগে উঠে দেখি, পুরো বত্রিশটা দাঁত বের করে হাবুল সেন দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা সন্দেহজনক পেনসিল। তখন আমার মনে হল, দাঁড়কাক নয়, হাবুলই পেনসিল দিয়ে আমার মাথায় ঠোকর দিচ্ছিল।

বললুম—এই হাবলা কী হচ্ছে?

হাবুল বললে-চায়ের ঘণ্টা পইড়া গেছে। রওনা হইতে হইব না নীল-পাহাড়িতে? তরে জাগাইতে আছিলাম।

—তাই বলে মাথায় পেনসিল দিয়ে ঠুকবি?

হাবুলের বত্রিশটা দাঁত চিকচিক করে উঠল—বোঝস নাই, একসপেরিমেন্ট করতাছিলাম।

—আমার মাথা নিয়ে তোর কিসের এক্সপেরিমেন্ট শুনি?

—দেখতাছিলাম, কয় পার্সেন্ট গোবর আর কয় পার্সেন্ট ঘিলু।

কী ধড়িবাজ, দেখেছ একবার। আমি দারুণ চটে বললুম—তার চাইতে নিজের মাথাটাই বরং ভালো করে বাজিয়ে নে। দেখবি গোবর—সেন্ট পার্সেন্ট।

-চ্যাতস ক্যান? চা খাইয়া মাথা ঠাণ্ডা করবি, চল।

টেনিদা আর ক্যাবলা আগেই চায়ের টেবিলে গিয়ে জুটেছিল, আমি গেলুম হাবুলের সঙ্গে। চা শেষ না হতেই খবর এল, বজ্রবাহাদুর তার গাড়ি নিয়ে হাজির।

ক্যাবলা বললে-নে, ওঠ ওঠ। আর গোরুর মতো বসে বসে টোস্ট চিবতে হবে না।

—নিজেরা তো দিব্যি খেলে, আর আমার বেলাতেই –

–আটটা পর্যন্ত ঘুমুতে কে বলেছিল, শুনি?–টেনিদা হুঙ্কার ছাড়ল।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ওরাই দলে ভারি। টোস্টটা হাতে নিয়েই উঠে পড়লুম। সন্দেশ দুটোও ছাড়িনি, ভরে নিলুম জামার পকেটে। যাচ্ছি সেই নীলপাহাড়ির রহস্যময় ঝাউ-বাংলোয়, বরাতে কী আছে কে জানে। যদি বেঘোরে মারাই যেতে হয়, তাহলে মরবার আগে অন্তত সন্দেশ দুটো খেয়ে নিতে পারব।

শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের দুর্দান্ত অ্যাঁডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়লুম। আরও আধঘণ্টা পরেই।

দার্জিলিং রেল স্টেশনের পাশ থেকে আমাদের গাড়িটা ছাড়তেই টেনিদা হাঁক ছাড়ল–পটলডাঙা-

আমরা তিনজন তক্ষুনি শেয়ালের মতো কোরাসে বললুম–জিন্দাবাদ।

বজ্রবাহাদুর স্টিয়ারিং থেকে মুখ ফেরাল। তারপর তেমনি পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল–কী জিন্দাবাদ বললেন?

চারজনে একসঙ্গে জবাব দিলুম–পটলডাঙা।

–সে আবার কী?

লোকটা কী গেঁয়ো, আমাদের পটলডাঙার নাম পর্যন্ত শোনেনি। আর সেখানকার বিখ্যাত চারমূর্তি যে তার গাড়িতে চেপে একটা লোমহর্ষক অ্যাঁডভেঞ্চারে চলেছি, তা-ও বুঝতে পারছে না।

টেনিদা মুখটাকে স্রেফ গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে-পটলডাঙা আমাদের মাদারল্যান্ড।

হাবুল বললে–উঁহু, ঠিক কইলা না। মাদারপাড়া।

–ওই হল, মাদারপাড়া। যাকে বলে–

ক্যাবলা বললে–ডি-লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস।

বজ্রবাহাদুর কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল, কী বুঝল সে-ই জানে। তারপর নিজের মনে কী একবার বিড়বিড় করে বলে গাড়ি চালাতে লাগল।

আমরাও মন দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলুম বসে বসে। পাহাড়ের বুকের ভেতর দিয়ে বাঁকে বাঁকে পথ চলেছে, কখনও চড়াই, কখনও উতরাই। কত গাছ, কত ফুল, কোথাও চা বাগান, কোথাও দুধের ফেনার মতো শাদা শাদা ঝরনা পথের তলা দিয়ে নীচেকুয়াশাঢাকা খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘুম বাঁ-দিকে রেখে পেশক রোড ধরে আমরা তিস্তার দিকে এগিয়ে চলেছি।

আমার গলায় আবার গান আসছিল–এমন শুভ্র নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়–কিন্তু বজ্রবাহাদূরের কথা ভেবেই সেই আকুল আবেগটা আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে হল। একেই লোকটার মেজাজ চড়া তার ওপর ডি-লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস শুনেই চটে রয়েছে। ওকে আর ঘাঁটানোটা ঠিক হবে না। পুবং-এর ঘি-দুধ খাওয়াবে বলেছে, তা ছাড়া গাড়ি তো ওরই হাতে। আমার গানের সুরে খেপে গিয়ে যদি একটু বাঁ দিকে গাড়িটা নামিয়ে দেয়, তা হলেই আর দেখতে হবে না। হাজার ফুট খাদ হা-হা করছে সেখানে।

হঠাৎ ক্যাবলা বললে–আচ্ছা টেনিদা?

–হুঁ।

–যদি গিয়ে দেখি সবটাই বোগাস?

–তার মানে?

মানে, ঝাউবাংলোয় সাতকড়ি সাঁতরা বলে কেউ নেই? ওই সবুজ দাড়িওয়ালা লোকটা আমাদের ঠকিয়েছে? রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে!

টেনিদার সে-জন্য কোনও দুশ্চিন্তা দেখা গেল না। বরং খুশি হয়ে বললে–তা হলে তো বেঁচেই যাই। হাড়-হাবাতে কাগামাছির পাল্লায় আর পড়তে হয় না।

হাবুল বললে–কষ্টডাই সার হই।

–কষ্ট আবার, কিসের? বজ্রবাহাদুরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টেনিদা বললে–পুবং-এর ছানা তা হলে আছে কী করতে?

গাড়িটা এবার ডানদিকে বাঁক নিলে। পথের দুধারে চলল সারবাঁধা পাইনের বন, টাইগার ফার্নের বন ঝোপ, থরে থরে শানাই ফুল। রাস্তাটা সরু-ছায়ায় অন্ধকার, রাশি রাশি প্রজাপতি উড়ছে। অত প্রজাপতি একসঙ্গে আমি কখনও দেখিনি। দার্জিলিং থেকে অন্তত মাইল বারো চলে এসেছি বলে মনে হল।

বজ্রবাহাদুর মুখ ফিরিয়ে বলল–নীলপাহাড়ি এরিয়ায় এসে গেছি আমরা।

নীলপাহাড়ি! আমরা চারজনেই নড়ে উঠলুম।

ঠিক তক্ষুনি ক্যাবলা বললে–টেনিদা, দেখেছ? ওই পাথরটার গায়ে খড়ি দিয়ে কী লেখা আছে?

গলা বাড়িয়ে আমরা দেখতে পেলুম, বড় বড় বাংলা হরফে লেখা : ছুঁচোবাজি।

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা পাথরের দিকে আমার চোখ পড়ল। তাতে লেখা : কুণ্ডুমশাই।

হাবুল চেঁচিয়ে উঠল—আরে, এইখানে আবার লেইখ্যা রাখছে : হঁড়িচাঁচা।

টেনিদা বললে- ড্রাইভার সায়েব, গাড়ি থামান। শিগগির।

বজ্রবাহাদুর কটমট করে তাকাল—আমি ড্রাইভার নই, মালিক।

–আচ্ছা, আচ্ছা, তা-ই হল। থামান একটু।

–থামাচ্ছি। বলে তক্ষুনি থামাল না বভ্রুবাহাদুর। গাড়িটাকে আর-এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে ব্রেক কষল। তারপর বললে–নামুন। এই তো ঝাউ-বাংলা।

আমরা অবাক হয়ে দেখলুম, পাশেই একটা ছোট টিলার মতো উঁচু জায়গা। পাথরের অনেকগুলো সিঁড়ি উঠেছে সেইটে বেয়ে। আর সিঁড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাইন আর ফুলবাগানে ঘেরা চমৎকার একটি বাংলো। ছবির বইতে বিলিতি ঘরদোরের চেহারা যেমন দেখা যায়, ঠিক সেই রকম। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

আমরা আরও দেখলুম, চোখে নীল গগ, বাঁদুরে টুপিতে মাথা মুখ ঢাকা, গায়ে ওভারকোট আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সাতকড়ি সাঁতরা।

বাঁদুরে টুপির ভেতর থেকে ভরাট মোটা গলার ডাক এল—এসো এসো! খোকারা, এসো! আমি তোমাদের জন্যে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি।

আর সেই সময় একটা দমকা হাওয়া উঠল, কী একটা কোত্থেকে খরখর করে আমার মুখে এসে পড়ল। আমি থাবা দিয়ে পাকড়ে নিয়ে দেখলুম, সেটা আর কিছুই নয়-চকোলেটের মোক।

বিনামূল্যে ফিল্ম শো

বজ্রবাহাদুর গাড়ি নিয়ে পুবং-এ চলে গেল।

যাওয়ার আগে বলে গেল কাল সকালে সে আবার আসবে। আমরা যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চাই, নিয়ে যাবে। টেনিদা কিন্তু আসল কথা ভোলেনি। চেঁচিয়ে বললে–বাঃ, পুবং-এর মাখন?

–দেখা যাক। বলে বজ্রবাহাদুর হেসে চলে গেল। এর ট্যাক্সি ভাড়াটা সাতকড়ি সাঁতরা আগেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা চারজনে ঝাউ বাংলোয় গিয়ে উঠলুম। সত্যি, বেড়ে জায়গা। চারদিক পাইন গাছে ঘেরা, নানা রকমের ফুলে ভরে আছে বাগান, কুলকুল করে একটা ঝরনাও বয়ে যাচ্ছে আবার। এসব মনোরম দৃশ্য-শ্য তো আছেই, কিন্তু তার চাইতেও সেরা বাংলোর ভেতরটা। সোফা-টোফা দেওয়া মস্ত ড্রয়িংরুম, কত রকম ফার্নিচার, দেওয়ালে কত সব বিলিতি ছবি!

সাতকড়ি আমাদের একতলা দোতলা সব ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর দোতলার এক মস্ত হলঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন–এইটে তোমাদের শোবার ঘর। কেমন, পছন্দ হয়?

পছন্দ বলে পছন্দ। প্রকাণ্ড ঘরটায় চারখানা খাটে বিছানা পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, দুটো পোশাকের আলমারি (ক্যাবলা বললে, ওয়ার্ডরোব), একটা মস্ত টেবিলের দুদিকে চারখানা চেয়ার, টেবিলের ওপরে ফুলদানি, পাশে স্নানের ঘর। আমি লক্ষ করে দেখলুম বইয়ের শেলফও রয়েছে একটা, তাতে অনেকগুলো ছবিওলা বিলিতি মাসিক পত্রিকা। ঘরটার তিনদিকে জানালা, তাই দিয়ে এন্তার পাহাড়-জঙ্গল আর দুরের চা বাগান দেখা যায়।

সাতকড়ি বললেন—ওই চা বাগানটা দেখছ? ওর একটা ভারি মজার নাম আছে।

আমরা জিজ্ঞেস করলুম-কী নাম?

-রংলি রংলিওট।

-কী দারুণ নাম। টেনিদা চমকে উঠল—মানে কী ওর?

হাবুল পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়ল—এইটা আর বুঝতে পারলা না? তার মানে হইল, মায়ে পোলারে ডাইক্যা কইতাছে—এই রংলি, সকাল হইছে, আর শুইয়া থাকিস না। উইঠ্যা পড়, উইঠ্যা পড়।

সাতকড়ি তার সবুজ দাড়িতে তা দিয়ে হাসলেন। বললেন—না, ওটা পাহাড়ি ভাষা। ওর মানে হল, এই পর্যন্তই, আর নয়।

-অদ্ভুত নাম তো। এনাম কেন হল?—আমি জানতে চাইলাম।

—সে একটা গল্প আছে, পরে বলব। আর ওই চা বাগানের ওপারে যে-পাহাড়টা দেখছ, তার নাম মংপু!

—মংপু?-ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—ওখানেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ এসে থাকতেন?

-ঠিক ধরেছ।-সাতকড়ি হাসলেন। সেইজন্যেই তো ওই পাহাড়টা চোখে পড়লেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। ধরো, খুব একটা জটিল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখছি, যেই মংপুর দিকে তাকিয়েছি-ব্যস!

-ব্যস! হাবুল বললে-অমনি কবিতা আইসা গেল!

-গেল বই কি। তরতর করে লিখতে শুরু করে দিলুম।

আমার মনে পড়ে গেল, সিঞ্চলে বসে কবিতা শুনিয়েছিলেন সাতকড়ি—ওগো পাইন। ঝলমল করছে জ্যোৎস্না, দেখাচ্ছে কী ফাইন।

টেনিদা বললে-তা হলে তো প্যালাকে নিয়ে মুস্কিল হবে। ওর আবার একটু কাব্যিরোগ আছে, রাত জেগে কবিতা লিখতে শুরু করে না দেয়। যদিও অঙ্কে বারো-টারের বেশি পায় না, তবে কবিতা নেহাত মন্দ লেখে না।

কাব্যিরোগের কথা শুনে মন্দ লাগেনি, কিন্তু অঙ্কে বারোর কথা শুনেই মেজাজটা দারুণ খিঁচড়ে গেল। আমি নাকমুখ কুঁচকে বিচ্ছিরিভাবে দাঁত বের করে বললুম—আর তুমি? তুমি ইংরেজীতে সাড়ে সাত পাওনি? তুমি পণ্ডিতমশাইকে ধাতুরূপ বলোনি, গৌ-গৌবৌ-গৌবর?

—ইয়ু প্যালা, শাট আপ।-বলে টেনিদা আমায় মারতে এল, কিন্তু মাঝখানে হাঁ হাঁ করে সাতকড়ি ওকে থামিয়ে দিলেন—আহা-হা, এখন এসব গৃহযুদ্ধ কেন? লড়াই করবার সময় অনেক পাবে, কাগামাছি তো আছেই।

সেই বিদঘুটে কাগামাছি! শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণ বেশ ছিলুম, দিব্যি প্রাকৃতিক শোভাটোভা দেখা হচ্ছিল, হঠাৎ অলুক্ষণে কাগামাছির কথা শুনে খুব খারাপ লাগল।

টেনিদা বললে-জানেন, কাল আপনি চলে আসবার পরেই পার্কের ভেতর কে একটা ছুঁচোবাজি ছুঁড়েছিল।

—অ্যাঁ, তবে ওর গুপ্তচর ওখানেও ছিল? সাতকড়ি একটা খাবি খেলেন। লোকটা নিশ্চয় কদম্ব পাকড়াশি।

-আসবার সময় দেখলাম, এক জায়গায় খড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে লেখা আছে-কুণ্ডুমশাই।—আমি জানালুম।

–আর একখানে লেইখ্যা রাখছে-হাঁড়িচাঁচা। হাবুল সরবরাহ করল।

—ওফ। আর বলতে হবে না।সাতকড়ি বললে–তবে তো শত্রু এবার দস্তুরমতো আক্রমণ করবে। আমার ফরমুলাটা বুঝি আর কাগামাছির হাত থেকে বাঁচানো যাবে না।

সাতকড়ি হাহাকার করতে লাগলেন।

ক্যাবলা বললে– তা হলে পুলিশে খবর দিলেই তো–

—পুলিশ! সাতকড়ি মাথা নাড়লেন। পুলিশ কিছু করতে পারবে না। বন্ধুগণ, তোমরাই ভরসা! বাঁচাবে না আমাকে, সাহায্য করবে না আমাকে?

বলতে-বলতে তাঁর চোখে প্রায় জল এসে গেল।

ওঁর অবস্থা দেখে আমার বুকের ভেতরটা প্রায় হায় হায় করতে লাগল। মনে হল, দরকার পড়লে প্রাণটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। এমনকি, টেনিদা পর্যন্ত করুণ সুরে বললে– কিছু ভাববেন না সাতকড়িবাবু, আমরা আছি।

হাবুলও একটা ঘোরতর কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাতকড়িবাবুর কাঞ্ছা এসে খবর দিলে, খানা তৈরি।

এটা সুখবর। দার্জিলিঙের রুটি-ডিম অনেক আগেই রাস্তায় হজম হয়ে গিয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কী, সাতকড়িবাবুর রান্নাঘর থেকে মধ্যে-মধ্যে এক-একটা বেশ প্রাণকাড়া গন্ধের ঝলক এসে থেকে-থেকে আমাদের উদাস করেও দিচ্ছিল বই কি!

সারাটা দিন বেশ কাটল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হল, দুপুরে সাতকড়িবাবু অনেক কবিতা-টবিতা শোনালেন। সেই ফরমুলাটার কথা বললেন—যা দিয়ে একটা গাছে

আম কলা আঙুর আপেল সব একসঙ্গে ফলানো যায়। আমি একবার ফরমুলাটা দেখতে চেয়েছিলুম, তাতে বিকট ভ্রুকুটি করে সাতকড়িবাবু আমার দিকে তাকালেন।

—এনসাইক্লোপিডিক ক্যাটাস্ট্রফি বোঝো?

সর্বনাশ! নাম শুনেই পিলে চমকে গেল। আমি তো আমি, স্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পাওয়া ক্যাবলা পর্যন্ত থই পেল বলে মনে হল না।

—প্রাণতোষিণী মহাপরিনির্বাণ-তন্ত্রের পাতা উল্টেছ কোনওদিন?

টেনিদা আঁতকে উঠে বললেন—আজ্ঞে না। ওল্টাতেও চাই না।

-নেবু চাডনাজার আর পজিট্রনের কম্বিনেশন কী জানো?

—জানি না।

—থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে অ্যাঁকোয়া টাইকোটিস যোগ করলে কী হয় বলতে পারো?

হাবুল বললে-খাইছে!

মিটিমিটি হেসে সাতকড়ি বললেন—তা হলে ফরমুলা দেখে তো কিছু বুঝতে পারবে না।

ক্যাবলা মাথা চুলকোতে লাগল। একটু ভেবে-চিন্তে বললে-দেখুন কী বলে, অ্যাঁকোয়া টাইকোটিস মানে তো জোয়ানের আরকতাই নয়? তা জোয়ানের আরকের সঙ্গে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি–

—ওই তো আমার গবেষণার রহস্য! সাতকড়ি আবার মিটমিট করে হাসলেন—ওটা বুঝলে তো ফরমুলাটা তুমিই আবিষ্কার করতে পারতে!

টেনিদা বললে- নিশ্চয়-নিশ্চয়! ক্যাবলার কথায় কান দেবেন না। সব জিনিসেই ওর সব সময় টিকটিক করা চাই। এই ক্যাবলা ফের যদি তুই ওস্তাদি করতে যাবি, তা হলে এক চড়ে তোর কান—

আমি বললুম-কানপুরে উড়ে যাবে।

সাতকড়ি বললে-আহা থাক, থাক; নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই। যাক বিকেল তো হল, তোমরা এখন চা-টা খেয়ে একটু ঘুরে এসো—কেমন? রাত্তিরে আবার গল্প করা যাবে।

সাতকড়ি উঠে গেলেন।

আমরা বেড়াতে বেরুলুম। বেশ নিরিবিলি জায়গাটি গ্রামে লোকজন অল্প, পাহাড়-জঙ্গল-ফুল আর ঝরনায় ভরা। থেকে-থেকে ফগ ঘনিয়ে আসছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে সমতলের একটুখানি সবুজ রেখা দেখা যায়, সেখানে একটা রুপোলি নদী চিকচিক করছে। একজন পাহাড়ি বললে-ওটা তিস্তা ভ্যালি।

সত্যি দার্জিলিঙের ভিড় আর হট্টগোলের ভেতর থেকে এসে মন যেন জুড়িয়ে গেল। আর মংপুর পাহাড়টাকে যতই দেখছিলুম, ততই মনে হচ্ছিল, এখানে থাকলে সবাই-ই কবি হতে পারে, সাতকড়ি সাঁতার কোনও দোষ নেই। কেবল হতভাগা কাগামাছিটাই যদি না থাকত-

কিন্তু কোথায় কাগামাছি। আশেপাশে কোথাও তার টিকি কিংবা নাক-ফাক কিছু আছে বলে তো বোধ হচ্ছে না। তাহলে পাথরের গায়ে খড়ি দিয়ে ওসব লিখলই বা কে! কে জানে!

রাত হল, ড্রয়িংরুমে বসে আবার আমরা অনেক গল্প করলুম। সাতকড়ি আবার একটা বেশ লম্বা কবিতা আমাদের শোনালেন–আমরা বেড়াতে বেরুলে ওটা লিখেছেন। তার কয়েকটা লাইন এই রকম–

ওগো শ্যামল পাহাড়–
তোমার কী বা বাহার,
আমার মনে জাগাও দোলা
করো আমায় আপনভোলা
তুমি আমার ভাবের গোলা
জোগাও প্রাণের আহার–

টেনিদা বললে–পেটের আহার লিখলেও মন্দ হত না।

সাতকড়ি বললেন–তা-ও হত। তবে কিনা, পেটের আহারটা কবিতায় ভালো শোনায় না।

হাবুল জানাল–ভাবের গোলা না লেইখ্যা ধানের গোলাও লিখতে পারতেন।

এইসব উঁচুদরের কাব্যচর্চায় প্রায় নটা বাজল। তারপর প্রচুর আহার এবং দোতলায় উঠে সোজা কম্বলের তলায় লম্বা হয়ে পড়া।

নতুন জায়গা, সহজে ঘুম আসছিল না। আমরা কান পেতে বাইরে ঝিঝির ডাক আর দূরে ঝরনার শব্দ শুনছিলুম। ক্যাবলা হঠাৎ বলে উঠল–দ্যাখ, আমার কী রকম সন্দেহ হচ্ছে। জোয়ানের আরকের সঙ্গে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি-ইয়ার্কি নাকি! তারপর লোকটা নিজেকে বলছে বৈজ্ঞানিক–অথচ সারা বাড়িতে একটাও সায়েন্সের বই দেখতে পেলুম না। খালি কতকগুলো বিলিতি মাসিকপত্র আর ডিটেকটিভ বই। আমার মনে হচ্ছে–

বলতে বলতে ক্যাবলা চমকে থেমে গেল—ওটা কিসের আওয়াজ রে!

কির-কির-কির পাশের বন্ধ ঘরটা থেকে একটা মেশিন চলবার মতো শব্দ উঠল। আর তারপরেই-

অন্ধকার ঘরের শাদা দেওয়ালে মাঝারি সাইজের ছবির ফ্রেমের মতো চতুষ্কোণ আলো পড়ল একটা। আরে এ কী! আমরা চারজনেই তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলুম-ছবি পড়ছে যে।

ছবি বই কি! সিনে ক্যামেরায় তোলা রঙিন ছবি! কিন্তু কী ছবি। এ কী—এ যে আমরাই। ম্যালে ঘুরছি—সিঞ্চলে সাতকড়ির সঙ্গে কথা কইছি—টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে যাচ্ছে ঝাউবাংলোর নীচে আমাদের গাড়িটা এসে থামল।

তারপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা :

কাটা মুণ্ডুর নাচ দেখবে
শুনবে হাঁড়িচাঁচার ডাক
কাগামাছির প্যাঁচ দেখে নাও
একটু পরেই চিচিংফাঁক।

সব শেষে :

ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হও।

—ঝুমুরলাল।
ফর কাগামাছি।

চৌকো আলোটা শাদা হয়ে দপ করে নিবে গেল। কির-কির করে আওয়াজটাও আর শোনা গেল না।

অন্ধকারে ক্যাবলাই চেঁচিয়ে উঠল—পাশের ঘর, পাশের ঘর! ওখান থেকেই প্রোজেক্টার চালিয়েছে।

টেনিদা আলো জ্বালাল। ক্যাবলা ছুটে গিয়ে পাশের বন্ধ ঘরের দরজায় লাথি মারল একটা।

দরজাটা খুলল না, ভেতর থেকে বন্ধ।

হাবুল ছুটে গিয়ে আমাদের ঘরের দরজা খুলতে গেল। সেটাও খুলল না। বাইরে থেকে কেউ শেকল বা তালা আটকে দিয়েছে বলে মনে হল।

কাটামুণ্ডুর নাচ

যতই টানাটানি করি আর চেঁচিয়ে গলা ফাটাই, দরজা আর কিছুতে খোলে না। শেষ পর্যন্ত হাবুল সেন থপ করে মেজের ওপরে বসে পড়ল।

—এই কাগামাছি অখন আমাগো মাছির মতন টপাটপ কইরা ধইরা খাইব।

—চার-চারটে লোককে গিলে খাবে-ইয়ার্কি নাকি? ক্যাবলা কখনও ঘাবড়ায় না। সে বললে–পুবদিকের জানলার কাছে বড় একটা গাছ রয়েছে টেনিদা। একটু চেষ্টা করলে সেই গাছ বেয়ে আমরা নেমে যেতে পারি।

আমি বললুমআর নামবার সঙ্গে সঙ্গে কাগামাছি আমাদের এক একজনকে–

-রেখে দে তোর কাগামাছি! সামনে আসুক না একবার, তারপর দেখা যাবে। টেনিদা তুমি আমাদের লিডার, তুমিই এগোও।

কনকনে শীত, বাইরে অন্ধকার, তার ওপর এই সব ঘোরতর রহস্যময় ব্যাপার। জানালা দিয়ে গাছের ওপর লাফিয়ে পড়াটড়া সিনেমায় মন্দ লাগে না, কিন্তু টেনিদার খুব উৎসাহ হচ্ছে বলে মনে হল না। মুখটাকে বেগুনভাজার মতো করে বললে–তারপর হাত-পা ভেঙে মরি। আর কি? ওসব ইন্দ্রলুপ্ত–মানে ধাষ্টামোর মধ্যে আমি নেই।

ক্যাবলা বললে–ইন্দ্রলুপ্ত মানে টাক। ধাষ্টামো নয়।

টেনিদা আরও চটে বললে– শাট আ। আমি বলছি ইন্দ্রলুপ্ত মানে ধাষ্টামো। আমাকে বাসনি ক্যাবলা, আমি এখন খুব সিরিয়াসলি সবটা বোঝবার চেষ্টা করছি।

ক্যাবলা বিরক্ত হয়ে বললে–তা হলে তুমি বোঝবার চেষ্টাই করো। আর আমি ততক্ষণে গাছ বেয়ে নামতে চেষ্টা করি।

টেনিদা বললে–এটা তো এক নম্বরের পুঁইচচ্চড়ি–মানে পুঁদিচ্চেরি বলে মনে হচ্ছে। এই প্যালা, শক্ত করে ওর ঠ্যাং দুটো টেনে ধর দিকি। এখুনি গাছ থেকে পড়ে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

পত্রপাঠ আমি ক্যাবলাকে চেপে ধরতে গেলুম আর ক্যাবলা তক্ষুণি পটাং করে আমাকে একটা ল্যাং মারল। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাবুলের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লুম আর হাবুল হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল-খাইছে–খাইছে।

টেনিদা চিৎকার করে বললে–অল কোয়ায়েট! এখন সমূহ বিপদ। নিজেদের মধ্যে মারামারির সময় নয়। বালকগণ, তোমরা সব স্থির হয়ে বসো, আর আমি যা বলছি তা কান পেতে শোনো। দরজা বন্ধ হয়ে আছে থাকুক-ওতে আপাতত আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি। হচ্ছে না। আমরা আপাতত কম্বল গায়ে চড়িয়ে শুয়ে থাকি। সকাল হোক–তারপরে

টেনিদা আরও কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি বাইরে থেকে বিকট আওয়াজ উঠল–চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ–

হাবুল বললে–প্যাঁচা!

আওয়াজটা এবার আরও জোরালো হয়ে উঠল : চ্যাঁ–চ্যাঁ-ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচা–

ক্যাবলা বললে--প্যাঁচা তো অত জোরে ডাকে না, তা ছাড়া ঘ্যাঁচা ঘ্যাঁচা করছে যে!

আমি পটলডাঙার প্যালারাম, অনেক দিন পালাজ্বরে ভুগেছি আর বাসকপাতার রস খেয়েছি। পেটে একটা পালাজ্বরের পিলে ছিল, সেটা পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেতে-খেতে কোথায় সটকে পড়েছিল। কিন্তু ওই বিকট আওয়াজ শুনে কোত্থেকে সেটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, আবার গুরুগুরু করে কাঁপুনি ধরে গেল তার ভেতর।

তখনি আমি বিছানায় উঠে পড়ে একটা কম্বল মুড়ি দিলুম। বললুম–আমি গোবরডাঙায় পিসিমার বাড়ি ও-আওয়াজ শুনেছি। ওটা হাঁড়িচাঁচা পাখির ডাক।

বাইরে থেকে সমানে চলতে লাগল সেই ঘ্যাঁচাঘ্যাঁচা শব্দ আর হাবুল ঝুমুরলালের সেই প্রায় কবিতাটা আওড়াতে লাগল :

গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়!

সবাই চুপ, আরও মিনিটখানেক ঘ্যাঁচার ঘ্যাঁচার করে হাঁড়িচাঁচা থামল। ততক্ষণে আমাদের কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, মাথা বনবন করছে, আর বুদ্ধিসুদ্ধি সব হালুয়ার মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে একেবারে। বেপরোয়া ক্যাবলা পর্যন্ত স্পিকটি নট। জানালা দিয়ে নামবার কথাও আর বলছে না।

হাবুল অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বললে-খুবই ফ্যাসাদে পইড়া গেলাম দেখতাছি! অখন কী করন যায়?

আমি আরও ভালো করে কম্বল মুড়ি দিয়ে বললুম-বাপ রে! কী বিচ্ছিরি আওয়াজ। আর-একবার হাঁড়িচাঁচার ডাক উঠলে আমি সত্যিই হার্টফেল করব, টেনিদা।

টেনিদা হাত বাড়িয়ে টকাস করে আমার মাথার ওপর একটা গাঁট্টা মারল।

—খুব যে ফুর্তি দেখছি, হার্টফেল করবেন। অঙ্কে ফেল করে করে তোর অভ্যেসই খারাপ হয়ে গেছে। আমরা মরছি নিজের জ্বালায় আর ইনি দিচ্ছেন ইয়ার্কি। চুপচাপ বসে থাক প্যালা! হার্ট-ফার্ট ফেল করাতে চেষ্টা করবি তো এক চাঁটিতে তোর কান-

এত দুঃখের মধ্যেও হাবুল বললে- কানপুরে উইড়া যাইব।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বসেছিল। ডাকল—টেনিদা?

-বলে ফেল।

রাত্তিরে হাঁড়িচাঁচা ডাকে নাকি?

আমি বললুম-কাগামাছি-স্পেশাল হাঁড়িচাঁচা। যখন খুশি ডাকতে পারে।

—দুত্তোর।-ক্যাবলা বিষম ব্যাজার হয়ে বললে-আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে, টেনিদা।

-কী সন্দেহ শুনি?

-কাগামাছি-টাছি সব বোগাস। ওই সবুজদাড়ি সাতকড়ি লোকটাই সুবিধের নয়। রাত্তিরে ইচ্ছে করে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। প্রকৃতিকে ভালোবাসলেই সবুজ রঙের

দাড়ি রাখতে হবে—এমন একটা যা-তা ফরমুলা বলছে—যার কোনও মানেই হয় না। থিয়োরি অভ রিলেটিভিটির সঙ্গে জোয়ানের আরক? পাগল না পেট-খারাপ ভেবেছে আমাদের।

টেনিদা বললে-কিন্তু সেই মিচকেপটাশ লোকটা?

—আর সিনে ক্যামেরা দিয়া আমাগো ছবিই বা তুলল কেডা? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

-আর ছুঁচোবাজিই বা ছুঁড়ল কে? আমি জানতে চাইলাম।

ক্যবলা বললে-। তবে সাতকড়ির পকেটে আমি দেশলাইয়ের খড়খড়ানি ঠিকই শুনতে পেয়েছিলুম। আমার মনে হয় সাতকড়িই কুয়াশার ভেতর থেকে ওটা ছুঁড়ে দিয়ে—

বলতে বলতেই আবার :

—চ্যাঁ-চ্যাঁ-ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা—

হাবুল বললে—উঃ-সারছে!

আমি প্রাণপণে কান চেপে ধরলুম।

ক্যবলা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বললে-বুঝেছি—জানলার নীচ থেকেই শব্দটা আসছে। আচ্ছা, দাঁড়াও।

বলেই আর দেরি করল না। টেবিলের ওপর কাচের জগভর্তি জল ছিল, সেইটে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে গব-গব করে ঢেলে দিলে। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচ করে আওয়াজটা থেমে গেল মাঝপথেই। তারপরেই মনে হল, বাইরে কে যেন হুড়মুড় করে ছুটে পালাল। আরও মনে হল, কে যেন অনেক দূরে ফ্যাঁচো করে হেঁচে চলেছে।

ক্যাবলা হেসে উঠল।

—দেখলে টেনিদা, হাঁড়িচাঁচা নয়—মানুষ। এক জগ ঠাণ্ডা জলে ভালো করে নাইয়ে দিয়েছি, সারা রাত ধরে হেঁচে মরবে এখন। রাত্তিরে আর বিরক্ত করতে আসবে না।

হাবুল বললে-কাগামাছি হাঁচতে আছে। আহা ব্যাচারাম শ্যাষকালে নিমোনিয়া না হয়।

টেনিদা বললে-হোক নিউমোনিয়া, মরুক। ফিলিম দেখাচ্ছে, সমানে ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা করছে—একটু ঘুমুতে দেবার নামটি নেই। চুলোয় যাক ওসব। দরজা যখন খুলবেই না—তখন আর কী করা যায়। তার চাইতে সবাই শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে যা হোক দেখা যাবে।

ক্যবলা বললে, হুঁ, তা হলে শুয়েই পড়া যাক। আবার যদি হাঁড়িচাঁচা বিরক্ত করতে আসে, তা হলে ওপর থেকে এবার চেয়ার ছুঁড়ে মারব।

কম্বল জড়িয়ে আমরা বিছানায় লম্বা হলুম, মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই টেনিদার নাক কুরকুর করে ডাকতে লাগল, হাবুল আর ক্যাবলাও ঘুমিয়ে পড়ল বলে মনে হল। কিন্তু আমার ঘুম আসছিল না। বাইরে রাত ঝমঝম করছে, ঝিঝি ডাকছেজানালার কাচের ভেতর থেকে কালোকালো গাছের মাথা আর আকাশের জ্বলজ্বলে একরাশ তারা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল বেশ ছিলুম দার্জিলিঙে, খামকা কাগামাছির পেছনে এই পাহাড়-জঙ্গলে এসে পড়েছি। কাছাকাছি জন-মানুষ নেই, এখন যদি কাগামাছি ঘরে ঢুকে আমাদের এক-একজনকে মাছির মতোই টপাটপ গিলে ফেলে, তা হলে আমরা ট্যাঁ-ফোঁ করবারও সুযোগ পাব না। তার ওপর এই শীতে এক-জগ ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢেলে দেওয়ায়

কাগামাছি নিশ্চয় ভয়ঙ্কর চটে রয়েছে। যদিও হাবুল আমার পাশেই শুয়েছে। তবু সাহস পাবার জন্যে ওকে আমি আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলুম।

—এই হাবলা, ঘুমুচ্ছিস নাকি?

আর হাবুল তক্ষুনি হাঁউমাউ করে এক রাম-চিকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

নাকের ডাক বন্ধ করে টেনিদা হাঁক ছাড়ল—কী—কী-হয়েছে?

ক্যাবলা কম্বলসুদ্ধু নেমে পড়তে গিয়ে কম্বলে জড়িয়ে দড়াম করে আছাড় খেল একটা।

টেনিদা বললে- কী হয়েছে রে হাবুল, চেঁচালি কেন?

-কাগামাছি আমারে তো মারছে।

-কাগামাছি নয়, আমি।-আমি এই কথাটা কেবল বলতে যাচ্ছি, ঠিক তখন—

তখন সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল।

বড় আলো দুটো নিবিয়ে একটা নীল বাতি জ্বেলে আমরা শুয়ে পড়েছিলুম। হালকা আলোয় ছায়া-ছায়া ঘরটার ভেতর দেখা গেল এক রোমহর্ষক দৃশ্য।

আমরাই চোখে পড়েছিল প্রথম। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম-ও কী?

ঘরের ঠিক মাঝখানে-শুন্যে কী ঝুলছে ওঠা!

আবছা আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল—ঠিক যেন হাওয়ায় একটা প্রকাণ্ড কাটামুণ্ডু নাচছে। তার বড় বড় দাঁত, দুটো মিটমিটে চোখ—ঠিক যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে সে।

আমরা চারজনেই এক সঙ্গে বিকট চিৎকার ছাড়লুম। তৎক্ষণাৎ ঘরের নীল আলোটাও নিবে গেল, যেন বিশ্রী গলায় হেসে উঠল, আর আমি–

আমার দাঁতকপাটি লাগল নির্ঘাত। আর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগেই টের পেলুম, খাটের ওপর থেকে একটা চালকুমড়োর মতো আমি ধপাস করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছি।

রাতের তদন্ত

খুব সম্ভব দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল। আর রাত দুপুরে মাথার ওপর বেমক্কা একটা কাটা মুণ্ডু এসে যদি নাচতে শুরু করে দেয় তাহলে কারই বা দাঁতকপাটি না লাগে? কিন্তু বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়েও থাকা গেল না, কে যেন পা ধরে এমন এক হ্যাঁচকা টান মারল যে, কম্বল-টম্বল। সুদ্ধ আমি আর এক পাক গড়িয়ে গেলুম।

তখনও চোখ বন্ধ করেই ছিলুম। হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে বললুম কাগামাছি কাগামাছি।

–দুত্তোর কাগামাছি। ওঠ বলছি–কোত্থেকে যেন ক্যাবলাটা চেঁচিয়ে উঠল।

উঠে বসে দেখি কাটা মুণ্ডু-টু কিছু নেই ঘরে আলো জ্বলছে। টেনিদা হাঁ করে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। হাবুল সেন গুটিগুটি বেরিয়ে আসছে একটা খাটের তলা থেকে।

টেনিদা বললে–ভূতের কাণ্ড রে ক্যাবলা! কাগামাছি স্রেফ ভূত ছাড়া কিছু নয়।

হাবুল কাঁপতে কাঁপতে বললে–মুলার মতো দাঁত বাইর কইর‍্যা খ্যাঁচখ্যাঁচ কইর‍্যা হাসতে আছিল। ঘাঁক কইর‍্যা একখান কামড় দিলেই তো কম্ম সারছিল।

ক্যাবলা বললে–হুঁ।

আমি বললুম–হুঁ কী? রাত ভোর হোক, তারপরেই আমি আর এখানে নেই। সোজা দার্জিলিং পালিয়ে যাব।

ক্যাবলা বুললে–পালা, যে-চুলোয় খুশি যা। কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ওই স্কাইলাইটটা লক্ষ করে দেখ।

–আবার মুণ্ডু আসছে নাকি?বলেই হাবুল তক্ষুনি খাটের তলায় ঢুকে পড়ল। টেনিদা একটা লাফ মারল আর আমি পত্রপাঠ বিছানায় উঠে কম্বলের তলায় ঢুকে গেলুম।

ক্যাবলা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললে–আরে তুমলোগ বহুত ডরপোক হো। দ্যাখ না তাকিয়ে ও-দিকে। স্কাইলাইটটা খোলা। ওখান দিয়ে দড়ি বেঁধে একটা মুণ্ডু যদি ঝুলিয়ে দেওয়া যায় আর তারপরেই যদি কেউ সুড়ত করে সেটাকে টেনে নেয়–তা হলে কেমন হয়?

টেনিদা জিগগেস করলে–তা হলে তুই বলছিস ওটা–

–হ্যাঁ যদুর মনে হচ্ছে, একটা কাগজের মুখোশ।

হাবুল আবার গুটিগুটি বেরিয়ে এল খাটের নীচের থেকে। আপত্তি করে বললে–না না, মুখোশ না। মুখে মুলার মতন দাঁত আছিল।

-তুই চুপ কর।-ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠলকাওয়ার্ড কোথাকার। শোন, আমি বলছি। যাওয়ার আগে যদি মুলোর মতো দাঁতগুলোকে আঁড়ো করে দিয়ে যেতে না পারি, তা হলে আমার নাম কুশল মিত্তিরই নয়!

–তার আগে ওইটাই আমাগো কচমচাইয়া চাবাইয়া খাইব।

www.bengaliebook.com

ক্যাবলা গজগজ করে কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দরজা দিয়ে সাতকড়ি সাঁতরা এসে ঢুকলেন।

–ব্যাপার কী হে তোমাদের? রাত সাড়ে বারোটা বাজে–এখনও তোমরা ঘুমোওনি নাকি। আমি হঠাৎ জেগে উঠে দেখি তোমাদের ঘরে আলো জ্বলছে। তাই খবর নিতে এলুম।

টেনিদা চটে বললে-আচ্ছা লোক মশাই আপনি। এতক্ষণে খবর নিতে এলেন। ওদিকে আমরা মারা যাওয়ার জো! বাইরে থেকে দরজা বন্ধ, ভেতরে ভূতের কাণ্ড চলছে, আর আপনি বলছেন ঘুমুইনি কেন।

সাতকড়ি অবাক হয়ে বললেন–কেন, দরজা তো খোলাই ছিল।

-খোলা ছিল। আধঘণ্টা টানাটানি করে আমরা খুলতে পারিনি।

সাতকড়ি ঘাবড়ে গেলেন। একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন কী হয়েছিল বলে দেখি?

আমি বললুম-বিনামুল্যে ফিলিম শো দেখেছি।

টেনিদা বললে-ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা করে কানের কাছে বিচ্ছিরিভাবে হাঁড়িচাঁচা ডাকছিল। এককুঁজো জল তার মাথায় ঢেলে ক্যাবলা তাকে তাড়িয়েছে।

হাবুল বললে-আর চালের থনে অ্যাঁকটা কাটা মুণ্ডু বত্রিশটা দাঁত বাইর কইরা তুরুকরুক লাফাইতে আছিল।

টেনিদা কষে একটা গাঁট্টা বাগাল। দাঁতে দাঁত ঘষে বললে- ব্যাটা নির্ঘাত মেফিস্টোফিলিস। একবার সামনে পেলে এমন দুটো ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেরে দেব যে ইয়াক-ইয়াক হয়ে যাবে।

সাতকড়ি বললে–দাঁড়াও-দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝে দেখি। তার আগে তোমাদের একটু ভুল শুধরে দিই। মেফিস্টোফিলিস হল শয়তান। পুরুষ-ফরাসী ভাষায় মাসকুল্যাঁ! আর মাসকুল্যাঁ হলে বলা উচিত ল্য গ্রাঁ। অর্থাৎ কিনা মস্ত বড়। আর ডি–অর্থাৎ দ্য টা ওখানে–

টেনিদা বললে–থামুন-থামুন। আমরা মরছি নিজের জ্বালায়, আর আপনি এই মাঝরাত্তিরে ফরাসী শোনাতে এসেছেন। আচ্ছা নোক তো!

—আচ্ছা, থাক-থাক। এখন খুলে বলো।

আমি বললুম—আপনি হাঁড়িচাঁচার ডাক শোনেননি?

-হাঁড়িচাঁচার ডাক? না তো!সাতকড়ি যেন গাছ থেকে পড়লেন।

হাবুল বললেন কী মশায়? আপনে কুম্ভকর্ণ নাকি! আমাগো কান ফাইটা যাইতাছিল আর আপনে শুনতেই পান নাই?

ক্যাবলা বললে–আঃ। তোরা একটু থাম তো বাপু। এমনভাবে সবাই মিলে বকবক করলে কোনও কাজ হয়? আমি বলছি শুনুন!

টেনিদা বললে– রাইট। অর্ডার– অর্ডার।

ক্যাবলা সব বিশদ বিবরণ শুনিয়ে দিলে সাতকড়িবাবুকে। সাতকড়ি কখনও হাঁ করলেন, কখনও চোখ গোল করলেন, কখনও বললেন, মাই ঘঃ–! শেষ পর্যন্ত শুনে একটা হুতোম প্যাঁচার মতো থ হয়ে রইলেন।

টেনিদা বললে–তা হলে–

-তা হলে সেই কাগামাছি! এবার ঘোর বেগে আমাকে আক্রমণ করেছে দেখছি। না, ফরমুলাটা আর বাঁচানো যাবে না মনে হচ্ছে। আমার এতদিনের সাধনা—এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার-সব গেল-

আমি বললুম—এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে যদি পুলিশে খবর দেন-

—পুলিশ।-সাতকড়ি সাঁতরা কিছুক্ষণ এমন বিচ্ছিরি মুখ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন যে, মনে হল এর চাইতে অদ্ভুত কথা জীবনে কোনওদিন তিনি শোনেননি।

ক্যাবলা বললে-আচ্ছা সাঁতরামশাই, আমাদের পাশের ঘরে কী আছে?

সাতকড়ি বললে-ওটা? ওটা স্ট্যাকরুম। মানে বাড়ির বাড়তি আর ভাঙাচুররা জিনিসপত্র জড়ো করে রাখা হয়েছে ওতে।

—ওর দরজায় চৌকো ফুটোটা এল কী করে? মানে যা দিয়ে এ-ঘরের দেওয়ালে প্রজেকটার দিয়ে ছবি ফেলা যায়?

—চৌকো ফুটো? সাতকড়ি আকাশ থেকে পড়লেনফুটো আবার কে করবে? ফুটোফাটার কথা আবার কেন? কোনও ফুটোর খবর তো আমি জানিনে।

-তা হলে জেনে নিন। ওই দেখুন।

সাতকড়ি উঠে দেখলেন আর দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

-সর্বনাশ! কাগামাছি দেখছি আমার ঘরে আড্ডা গেড়েছে। এবার আমি গেলুম।-সবুজ দাড়ি মুঠোয় চেপে ধরে তিনি হায় হায় করতে লাগলেন—একেবারে মারা গেলুম দেখছি।

ক্যাবলা বললে-মারা একটু পরে যাবেন। তার আগে ওই ঘরটা খুলবেন চলুন।

–ঘর? মানে ও-ঘরটা? ও খোলা যায় না!

–কেন খোলা যায় না?

সাতকড়ি বুঝিয়ে বললেন–মানে আসবার সময় ও-ঘরের চাবি কলকাতায় ফেলে এসেছি কিনা। আর দুটো পেল্লায় তালা ও-ঘরে লাগানো আছে।

–সে-তালা ভাঙতে হবে!

সাতকড়ি হেসে বললেন–তা হলে দার্জিলিং থেকে কামার আনতে হয়। এমনিতে ও ভাঙবার বস্তু নয়।

টেনিদা বললে–চলুন, দেখা যাক।

সবাই বেরুলুম। সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে তখন। সাতকড়িই জ্বেলে দিয়েছেন নিশ্চয়। পাশের ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। আধ হাত করে লম্বা দুটো তালা ঝুলছে। কামারেরও শানাবে বলে মনে হল না–খুব সম্ভব কামান দাগাতে হবে।

টেনিদা বললে– কাল সকালে দেখতে হবে ভালো করে।

ক্যাবলা বললে–এবার চলুন, বাইরে বেরুনো যাক।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম–আবার বাইরে কেন? কোথায় কাগামাছির লোক ঘাপটি মেরে বসে আছে। তার ওপর এই হাড়-কাঁপানো শীত–বরং কালকে–

ক্যাবলা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে–তবে তুই একলা ঘরে শুয়ে থাক। আমরা দেখে আসি।

সর্বনাশ, বলে কী! একলা ঘরে থাকব! আর কায়দা পেয়ে ওপর থেকে কাটা মুণ্ডুটা ঝাঁ করে আমাকে তেড়ে আসুক! কামড়াবারও দরকার হবে না—আর-একবার দন্ত-বিকাশ করলেই আমি গেছি।

দাড়িটা চুলকে নিয়ে বললুম-না-না, চলো, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি। মানে, তোমাদেরও তো একটু সাহস দেওয়া দরকার!

বাইরে ঠাণ্ডা কালো রাত। পাইনের বন কাঁপিয়ে হু হু করে বাতাস দিচ্ছে-কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। দূরের কালো কালো পাহাড়ের মাথায় মোটা ভুটিয়া কম্বলের মতো পুরু পুরু মেঘ জমেছে, লাল বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে তার ভেতরে। সব মিলিয়ে যেন বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল আমার। এমন রাতে কোথায় ভরপেট খেয়ে লেপ কম্বলের তলায় আরামসে ঘুম লাগাব, তার বদলে হতচ্ছাড়া কাগামাছির পাল্লায় পড়ে- উফ!

সাতকড়ি সঙ্গে টর্চ এনেছিলেন। সেই আলোয় আমরা দেখলুম, ঠিক আমাদের জানালার নীচে মাটিতে খানিকটা জল রয়েছে তখনও, আর তার ভেতর কার জুতোপরা পায়ের দাগ।

ক্যাবলা বললে- হাঁড়িচাঁচা। মাথায় জল পড়তে কেটে পড়েছে।

পাশেই ঘাস। কাজেই জুতোপরা হাঁড়িচাঁচা কোনদিকে যে পালিয়েছে বোঝা গেল না। আরও খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে আমরা আবার ফিরে এলুম।

সাতকড়ি বললেন—যা হওয়ার হয়েছে এবার তোমরা শুয়ে পড়ো। আজ আর কোনও উৎপাত হয়তো হবে না। যাই হোক আমি রাত জেগে পাহারা দেব এখন।

টেনিদা বললে—আমরাও পাহারা দেব!

www.bengaliebook.com

-না-না, সে কী হয়। হাজার হোক তোমরা আমার অতিথি। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। দরকার হলে তোমাদের আমি ডাকব এখন।

আমরা যখন শুতে গেলাম, তখন ঝাউ বাংলোর হলঘরের ঘড়িটায় টং করে একটা বাজল।

শোবার আগে দুটো কাজ করল ক্যাবলা। প্রথমে দড়ি টেনে টেনে সব কটা স্কাইলাইট ভালো করে বন্ধ করল, তারপর ড্রেসিং টেবিলটা টেনে এনে পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করালে যাতে ওখান থেকে কাগামাছি আবার আমাদের দেওয়ালে প্রজেক্টারের আলো ফেলতে না পারে।

তারপর কাগামাছির কথা ভাবতে-ভাবতে আমাদের ঘুম এল, আর সেই ঘুম একটানা চলল সকাল পর্যন্ত। কিন্তু তখন আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি—পরের দিন কী নিদারুণ বিভীষিকা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

সাতকড়ি গায়েব

ঘুমব কী ছাই! সকলকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে হল কাঞ্ছুর হাঁউমাউ চিৎকারে।

-কী হল কাঞ্ছা-ব্যাপার কী?

কাঞ্ছা বললে-বাবু গায়েব।

-গায়েব?

কাঞ্ছা জবাব দিল-জু!

—কোথায় গায়েব? কেমন করে গায়েব?

কাঞ্ছা হাঁউমাউ করে অনেক কথাই বলে গেল নেপালী ভাষায়। তোমরা তো আর সবাই নেপালী বুঝবে না, সন্দেশের সম্পাদকমশাইরাও সে কান্না-ভেজানো ভাষা কতটা বুঝবেন তাতে আমার সন্দেহ আছে। তাই সকলের সুবিধের জন্যে কাঞ্ছার কথাগুলো মোটামুটি শাদা বাংলায় লিখে দিচ্ছি–

কাঞ্ছার বক্তব্য হচ্ছে–

রোজ ভোর পাঁচটায় নাকি সাতকড়ি সাঁতরা এককাপ চা খেতেন। কাঞ্ছা বললে–ব্যাড-টি। আর শৌখিন লোক সবুজদাড়ি সাঁতরামশাই খারাপ চা খেতেন ভাবতেই আমরা বিচ্ছিরি লাগল। ক্যাবলা আমার কানে কানে বললে--বোধ হয় বেড-টি মিন করেছে। যাই হোক, ভোরবেলা কাঞ্ছা চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই একেবারে থ। বাংলা ডিটেকটিভ বইতে লেখা থাকে–হুবহু ঠিক তাই ঘটেছে। অর্থাৎ ঘরটি একেবারে তছনছ বালিশ কম্বল সব মেঝেয় পড়ে আছে, এক কোণে একটা টিপয় কাত হয়ে রয়েছে, কার একটা ভাঙা হুঁকো রয়েছে সাতকড়ির বিছানার ওপর, দরজার বাইরে একগাছা মুড়ো ঝাঁটা, সিঁড়িতে দেখা যাচ্ছে কুকুরে-চিবুনো একপাটি চপ্পল। মানে অনেক কিছুই আছে–কেবল নেই সাতকড়ি সাঁতরা। তিনি স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছেন।

টেনিদা বললে–বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কাঞ্ছা জানালে, সেটা অসম্ভব। কারণ ভোর পাঁচটায় ব্যাড-টি না পেলে, পাঁচটা বেজে সাত মিনিটের সময় সাতকড়ি চিৎকার করে কাঞ্ছাকে ডাকেন আর গ্যাড-ম্যাড করে ইংরেজীতে গাল দিতে থাকেন। সুতরাং চা না খেয়ে ঘর থেকে বেরুবেন এমন বান্দাই তিনি নন। তা ছাড়া নিজের বালিশ-বিছানা নিয়ে এর আগে তাঁকে কোনওদিন কুস্তি লড়তেও দেখা যায়নি। আরও বড় কথা, ভাঙা হুঁকো, মুড়ো ঝাঁটা আর কুকুরে-চিবনো চপ্পলই বা এল কোত্থেকে? তবু দেড় ঘণ্টা-দু ঘণ্টা ধরে কাঞ্ছা সব জায়গায় তাঁকে খুঁজেছে। কিন্তু কোথাও তাঁর সবুজ দাড়ির ডগাটি পর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এসে ডেকে তুলেছে আমাদের।

কিছুক্ষণ আমরা বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষে টেনিদা বললে–তা হলে একবার দেখে আসা যাক ঘরটা।

হাবুল সেন বললে–দেইখ্যা আর হইব কী! কাগামাছিতে তারে লইয়া গেছে।

ক্যাবলা বললে–তুই একটু চুপ কর তো হাবুল। দেখাই যাক না একবার।

আমরা সাতকড়ি সাঁতরার ঘরে গেলুম। ঠিকই বলেছে কাঞ্ছা। ঘরের ভেতরে একেবারে হইহই কাণ্ড রইরই ব্যাপার। সবকিছু ছড়িয়ে-ড়িয়ে একাকার। ভাঙা হুঁকো ছেঁড়া চপ্পল, মুড়ো-ঝাঁটা—সব রেডি।

টেনিদা ভেবে-চিন্তে বললে–ওই ভেঁড়া চপ্পল পায়ে দিয়ে হুঁকো খেতে খেতে কাগামাছি এসেছিল!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে–হ। আর ওই ঝাঁটাটা দিয়া সাঁতরা মশাইরে রাম-পিটানি দিছে।

তখন আমার মগজে দারুণ একটা বুদ্ধি তড়াং করে নেচে উঠল। আমি বললুম-ভাঙা হুঁকোতে তামাক খাবে কী করে? ওর একটা গভীর অর্থ আছে। জাপানীরা হুঁকো কবিতা লেখে কিনা, তাই কাগামাছি কোটা রেখে জানিয়ে গেছে যে সে জাপানী।

শুনে ক্যাবলা ঠিক ডিমভাজার মতো বিচ্ছিরি মুখ করে আমাকে ভেংচে উঠল-থাম থাম, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না। হাইকু কবিতা হুঁকো হবে কোন্ দুঃখে? আর কার এমন দায় পড়েছে যে সাত বছরের পুরনো কুকুরের-খাওয়া চটি পায়ে দেবে? পায়ে কি দেওয়াই যায় ওটা? তা ছাড়া কে কবে শুনেছে যে ডাকাত মুড়োঝাঁটা নিয়ে আসে? সে তো পিস্তল-টিস্তল নিয়ে আসবে।

—হয়তো কাগামাছির পিস্তল-টিস্তল নেই, সে গরিব মানুষ। আর ওটা যে সাধারণ একটা মুড়ো খ্যাংরা তাই বা কে বললে-? হয়তো ওর প্রত্যেকটা কাঠিতে সাংঘাতিক বিষ রয়েছে, হয়তো ওর মধ্যে ডিনামাইট ফিট করা আছে

ক্যাবলার ডিমভাজার মতো মুখটা এবার আলুকাবলির মতো হয়ে গেল-হয়তো ওর মধ্যে একটা অ্যাটম বম আছে, দুটো স্পুটনিক আছে, বারোটা নেংটি ইঁদুর আছে? যত সব রদ্দিমাকা ডিটেকটিভ বই পড়ে তোদের মাথাই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। বলে, আমরা হাঁই-হাই করে ওঠবার আগেই সে মুড়োঝাঁটায় জোর লাথি মারল একটা। বোমা ফাটল না, দাড়ম-দুড়ম কোনও আওয়াজ হল না, ক্যাবলা মারা পড়ল না, কেবল ঝাঁটাটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে সোজা বাগানে গিয়ে নামল।

ঠিক তখন ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—আরে এইটা কী?

হুঁকোর মাথায় যেখানটায় কলকে থাকে, সেখানে একটা কাগজের মতো কী যেন পাকিয়ে গোল করে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। হাবুল হুঁকোটা তুলে আনতেই টেনিদা ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিলে।

ডিটেকটিভ বইতে যেমন লেখা থাকে, অবিকল সেই ব্যাপার।

একখানা চিঠিই বটে। আমরা একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, চিঠিতে লেখা আছে : প্রিয় চার বন্ধু!

কাগামাছি দলবল নিয়ে ঘেরাও করেছে—দুমিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। আমি জানি, এক্ষুনি তারা লোপাট করবে আমাকে। তাই ঝটপট লিখে ফেলছি চিঠিল। আমাকে গায়েব করে ফরমুলাটা জেনে নেবে। তোমরা আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো। কিন্তু সাবধান—পুলিশে খবর দিয়ো না। তা হলে তক্ষুনি আমায় খুন-

অন্ন লেখা নেই। কিন্তু চিঠিটা যে সাতকড়িরই লেখা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এটুকু লেখবার পরেই সদলবলে কাগামাছি এসে ওঁকে খপ করে ধরে ফেলেছে।

রহস্য নিদারুণ গভীর! এবং ব্যাপার অতি সাংঘাতিক!

আমরা চারজনেই দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলুম। এখন কী করা যায়?

একটু পরে টেনিদা বললে–দা-দার্জিলিঙেই চলে যাব নাকি রে?

হাবুল বললে–হ, সেইডা মন্দ কথা না। বজ্রবাহাদুর গাড়ি নিয়া আসলেই–

ক্যাবলা চটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—তোমাদের লজ্জা করে না? বিপদে পড়ে ভদ্রলোক ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে ডাকাতের হাতে ফেলে পালাবে? পটলডাঙার ছেলেরা এত কাপুরুষ? এর পরে কলকাতায় ফিরে মুখ দেখাবে কী করে?

হাবুল সেনের একটা গুণ আছে সব সময়েই সকলের সঙ্গে সে চমৎকার একমত হয়ে যেতে পারে। সে বললে–হ সত্য কইছ। মুখ দ্যাখান যাইব না।

আমি বললুম-কিন্তু সাঁতরামশাইকে কোথায় পাওয়া যাবে? হয়তো এতক্ষণে তাঁকে কোনও গুপ্তগৃহে–

–শাট আপ—গুপ্তগৃহ! রাগের মাথায় ক্যাবলার মুখ দিয়ে হিন্দীতে বেরুতে লাগল—কেয়া, তুমলোগ মজাক কর রহে হে? বে-কোয়াশ বাত ছোড়। গুপ্তগৃহ অত সহজে মেলে নাও শুধু ডিটেকটিভ বইতেই লেখা থাকে। চলোবাড়ির পেছনে পাইনের বনটা আগে একটু খুঁজে দেখি! তারপর যা হয় প্ল্যান করা যাবে!

টেনিদা মাথা চুলকে বললে–এক্ষুনি?

–এক্ষুনি।

টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকের ডগাটা কেমন যেন বেঁটে হয়ে গেল—মানে একটু চা-টা না খেয়ে বেরুলে কী বলে ঠিক গায়ের জোর পাওয়া যাবে না। খিদেও তো পেয়েছে-তাই-

ক্যাবলা বললে–এই কি তোমার খাবার সময়? শেম—শেম!

শেম—শেম শুনেই আমাদের লিডার সঙ্গে সঙ্গে বুক টান করে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের একটা খুঁটি ধরে বার তিনেক বৈঠক দিয়ে টেনিদা বললে–অলরাইট! চল—এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়া যাক।

কিন্তু কাঞ্ছা অতি সুবোধ বালক। সাতকড়ি লোপাট হয়ে গেছেন বটে, কিন্তু কাঞ্ছা নিজের ডিউটি ভুলে যায়নি। সে বললে–ব্রেকফাস্ট তৈরিই আছে বাবু। খেয়েই বেরোন।

ক্যাবলার দিকে আমরা ভয়েভয়ে তাকালুম। ক্যাবলা বললে--বেশ, তা হলে খেয়েই বেরুনো যাক। কিন্তু মাইন্ড ইট-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে। আর এই প্যালাটা যে আধ ঘণ্টা ধরে বসে টোস্ট চিবুবে সেটা কিছুতেই চলবে না।

–বা-রে, যত দোষ আমার ঘাড়েই! আমার রাগ হয়ে গেল। বললুম—আমিই বুঝি আধ ঘণ্টা ধরে টোস্ট চিবুই? আর তুই যে কালকে এক ঘণ্টা ধরে মুরগির ঠ্যাং কামড়াচ্ছিলি, তার বেলায়?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

টেনিদা কড়াং করে আমার কানে জোর একটা চিমটি দিয়ে বললে-ই চোপ-বিপদের সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই।

আমি চেঁচিয়ে বললুম-খালি আমাকেই মারলে? আর ক্যাবলা যে–

–ঠিক। ও-ও বাদ যাবে না বলেই টেনিদা ক্যাবলাকে লক্ষ্য করে একটা রাম চাঁটি হাঁকড়াল। ক্যাবলা সুট করে সরে গেল, আর চঁচিটা গিয়ে পড়ল হাবুলের মাথায়।

–খাইছে খাইছে! বলে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল। একেবারে ষাঁড়ের মতো গলায়।

শত্রুর ভীষণ আক্রমণ

খেয়েদেয়ে আমরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

ঝাউবাংলোর ঠিক পেছনেই জঙ্গলটা! পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে কত দূর পর্যন্ত চলে গেছে কে জানে! সারি সারি পাইনের গাছ, এখানে-ওখানে টাইগার ফার্নের ঝোপ, বড় ধুতরোর মতো শানাই ফুল, পাহাড়ি উঁই-চাঁপা। শাদায়কালোয় মেশানো সোয়ালোর ঝাঁক মধ্যে-মধ্যে আশপাশ দিয়ে উড়ে যেতে লাগল তীর বেগে, কাকের মতো কালো কী পাখি লাফাতে লাফাতে বনের ভেতর অদৃশ্য হল আর লতা-পাতা, সোঁদা মাটি, ভিজে পাথরের ঠাণ্ডা গন্ধ–সব মিলিয়ে ভীষণ ভালো লাগল জঙ্গলটাকে।

আমি ভাবছিলুম এই রকম মিষ্টি পাহাড় আর ঠাণ্ডা বনের ভেতর সন্নিসি-টন্নিসি হয়ে থাকতে আমিও রাজি আছি, যদি দুবেলা বেশ ভালোমতন খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। সত্যি বলতে কী, আমার সকালবেলাটাকে ভীষণ ভালো লাগছিল, এমন কি সবুজদাড়ি, সাতকড়ি সাঁতরা, সেই হতচ্ছাড়া কাগামাছি, সেই মিচকেপটাশ কদম্ব পাকড়াশি–সব মুছে। গিয়েছিল মন থেকে। বেশ বুঝতে পারছিলুম, এই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ান বলেই সাতকড়ির মগজে কবিতা বিজ বিজ করতে থাকে :

ওগো পাইন,
ঝিলমিল করছে জ্যোৎস্না
দেখাচ্ছে কী ফাইন!

আমিও প্রায় কবি-কবি হয়ে যাচ্ছি, এমন সময় টেনিদা বললে–দুৎ, এসবের কোনও মানেই হয় না। কোথায় খুঁজে বেড়াবে বল দিকি বনের মধ্যে? আর তা ছাড়া সাতকড়িবাবুকে নিয়ে জঙ্গলের দিকেই তারা গেছে তারও তো প্রমাণ নেই।

আমি বললুম-ঠিক। সামনে অত বড় রাস্তা থাকতে খামকা জঙ্গলেই বা ঢুকবে কেন?

ক্যাবলা বললে–প্রমাণ চাও? ওই দ্যাখো!

আরে তাই তো! একটা ঝোপের মাথায় রঙচঙে কী আটকে আছে ওটা? এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে পাকড়াও করল হাবুল

এই জিনিসটা আর কিছুই নয়। চকোলেটের মোড়ক! তা হলে নিশ্চয়–

আমি বললুম–কদম্ব পাকড়াশি!

হাবুল ঝোপের মধ্যে কী খুঁজছিল।

ক্যাবলা বললে–আর কিছু পেলি নাকি রে?

হাবুল বললে–না–পাই নাই। খুঁইজ্যা দেখতাছি। যদি চকোলেটখানাও এইখানে পইড়া থাকে, তাহলে জুত কইরা খাওন যাইব।

–জুত করে আর খেতে হবে না! চলে আয়!–কড়া গলায় ডাকল ক্যাবলা। ব্যা

জার হয়ে হাবুল চলে এল। আর এর মধ্যেই আর-একটা আবিষ্কার করল টেনিদা।

www.bengaliebook.com

মোড়কটার পেছন দিকে শাদা কাগজের ওপর পেনসিল দিয়ে কী সব লেখা।

—এ আবার কী রে ক্যাবলা?

ক্যাবলা কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল। এবারেও একটা ছড়া—

সাঁতরামশাই গুম
টাক ডুমাডুম ডুম।
বৃক্ষে ও কী লম্ব
বলছে শ্রীকদম্ব!

সেই কদম্ব পাকড়াশি! সেই ধুসো মাফলার জড়ানো, সেই মিচকে-হাসি ফিচকে লোকটা! লেখা পড়ে আমরাও গুম হয়ে রইলুম। তারপর টেনিদা বললে- ক্যাবলা!

ক্যাবলা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে–হুঁ!

–কী বুঝছিস?

—এই জঙ্গলের মধ্যেই তা হলে কোথাও ওরা আছে।

—কিন্তু কোথায় আছে? আমি বললুম-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একেবারে সিকিম-ভূটান পার হয়ে যাব নাকি?

ক্যাবলা আরও গম্ভীর হয়ে বললে–দরকার হলে তাও যেতে হবে।

—খাইছে! হাবুলের আর্তনাদ শোনা গেল।

ক্যাবলা তাতে কান দিল না। ছড়াটা আর একবার নিজে নিজেই আউড়ে নিয়ে বললে–সাঁতরামশাই গুম হয়েছেন এটা তো পরিষ্কার দেখাই যাচ্ছে।

—আর সেইজন্য আনন্দে কাগামাছি আর কদম্ব বলছে টাকডুমাডুম। আমি ব্যাখ্যা করে দিলুম।

হাবুল বললে- কদম্ব সেই কথাই কইতে আছে।

ক্যাবলা ভুরু কোঁচকাল। শার্টের পকেট থেকে একটা চুয়িংগাম মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বললে-এ-সব ঠিক আছে। কিন্তু বৃক্ষে ও কী লম্ব—এর মানে কী?—গাছে কী ঝুলছে?

—গাছে কী ঝুলব? পাকা কাঁটাল ঝুলতে আছে বোধ হয়।

শুনেই টেনিদা ভীষণ খুশি হয়ে উঠল!

—পাকা কাঁটাল ঝুলছে? তাই নাকি? কোথায় ঝুলছে রে?

-তুমলোগ কেতনা বেফায়দা বাত কর রহে হো?-ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—খাওয়ার কথা শুনলেই তোমাদের কারও আর মাথা ঠিক থাকে না। পাইন বনের ভেতর পাকা কাঁটাল কোত্থেকে ঝুলছে? আর এই সময়? ওর একটা গভীর অর্থ আছে, বলে আমার মনে হয়।

-কী অর্থ শুনি?-কাঁটাল না পেয়ে ব্যাজার হয়ে জিগগেস করল টেনিদা।

—একটু দেখতে হচ্ছে। চলো, এগোনো যাক।

বেশি দূর এগোবার দরকার হল না। এবারে চেঁচিয়ে উঠল হাবুলই।

—ওই—ওইখানেই ঝুলতাছে।

-কী ঝুলছে? কী ঝুলছে?—আমরা আরও জোরে চিৎকার করলুম।

–দেখতে আছ না? ওই গাছটায়?

কী একটা পাহাড়ি গাছ। বেশি উঁচু নয়, কিন্তু অনেক ডালপালা আর তাতে বানর লাঠির মতো লম্বা লম্বা সব ফল রয়েছে। সেই গাছের মগডালে শাদা কাপড়ের একটা পুঁটলি।

আমরা খানিকক্ষণ হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম। তারপর টেনিদা বললে–তা হলে ওটাই সেই বৃক্ষে লম্ব ব্যাপার।

ক্যাবলা বললে–হুঁ।

টেনিদা বললে–তা হলে ওটাকে তো পেড়ে আনতে হয়।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম–দরকার কী টেনিদা––যা লম্বা হয়ে আছে তা ওই লম্বমান। থাকুক না! ওটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কাজ নেই।

হাবুল বললে–হ, সত্য কইছস। কয়েকটা বোম্বা-টোম্বা লম্ব কইরা রাখছে কি না কেডা কইব? দুড়ুম কইরা ফাইট্যা গিয়া শ্যাষে আমাগো উড়াইয়া দিব।

টেনিদা বললে–হুঁ- তা-ও অসম্ভব নয়।

ক্যাবলা বললে- ভিতুর ডিম সব! ছো ছো, এমনি কাওয়ার্ডের মতো তোমরা কাগামাছির সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাও! যাও–এখুনি সবাই মুখে ঘোমটা টেনে দার্জিলিঙে পালিয়ে যাও!

টেনিদা মধ্যে-মধ্যে বেগতিক দেখলে এক-আধটু ঘাবড়ে যায় বটে, কিন্তু কাওয়ার্ড কথাটা শুনলেই সে সিংহের মতো লাফিয়ে ওঠে। আর আমি পটলডাঙার পালারাম, এককালে যার কচি পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলই নিত্য বরাদ্দ ছিল, আমার মনটাও সঙ্গে সঙ্গে শিঙিমাছের মতো তড়পে ওঠে।

টেনিদা বললে-কী বললি! কাওয়ার্ড! ঠিক আছে, মরতে হয় তো আমিই মরব! যাচ্ছি গাছে উঠতে। শুনে আমার রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে গেল :

আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও মনে হল, বীরের মতো মরবার সুযোগ যদি এসেই থাকে আমিই বা ছাড়ব কেন? এগিয়ে গিয়ে বললুম- তুমি আমাদের লিডার—মানে সেনাপতি। প্রাণ দিতে হলে সৈনিকদেরই দেওয়া উচিত। সেনাপতি মরবে কেন? আমিই গাছে উঠব।

ক্যাবলা বললে-শাবাশ-শাবাশ!

আর টেনিদা আর হাবুল মিলে দারুণ ক্ল্যাপ দিয়ে দিলে একখানা! ক্ল্যাপ পেয়ে ভীষণ উৎসাহ এসে গেল। আমি তড়াক করে গাছে চড়তে গেলুম। কিন্তু একটু উঠেই টের পেলুম, প্রাণ দেওয়াটা শক্ত কাজ নয়—তার চাইতে আরও কঠিন ব্যাপার আছে। মানে কাঠপিঁপড়ে!

টেনিদা বললে-তাতে কী হয়েছে! বীরের মতো উঠে যা! আর নজরুলের মতো ভাবতে থাক : আমি ধূর্জটি-আমি ভীম ভাসমান মাইন।

কামড়ে ত্রিভুবন দেখিয়ে দিচ্ছে—এখন মাইন-টাইন কারও ভালো লাগে? দাঁত-টাঁত খিঁচিয়ে মুখটাকে ঠিক ডিমের হালুয়ার মতো করে আমি গাছের ডগায় উঠে গেলুম!

সামনেই দেখছি কাপড়ের পুঁটলিটা। একবারের জন্য হাত কাঁপল, বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করে উঠল। যদি সত্যিই একটা বোমা ফাটে? যদি কিন্তু ভেবে আর লাভ নেই। কবি লিখেছেন—মরতে হয় তো মর গে! আর যেরকম পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে, তাতে বোমার ঘায়ে মরাই ঢের বেশি সুখের বলে মনে হল এখন।

দিলুম হাত। ভেতরে কতগুলো কী সব রয়েছে। ফাটল না।

টেনিদা বললে,–টেনে নামা। তারপর নীচে ফেলে দে।

আমি দেখলুম, পুঁটলিটা আলগা করেই বাঁধা আছে, খুলতে সময় লাগবে না, নীচে ওদের ডেকে বললুম–আমি ফেলছি, তোমরা সবাই সরে যাও। যদি ফাটে-টাটে–

ফেলে দিলুম, তারপরেই ভয়ে বন্ধ করলুম চোখ দুটো। পুঁটলিটা নীচে পড়ল, কিন্তু কোনও অঘটন ঘটল না, কোনও বিস্ফোরণও হল না। তাকিয়ে দেখি, ওরা গুটিগুটি পুঁটলিটার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু গাছে আর থাকা যায় না কাঠপিঁপড়েরা আমার ছাল-চামড়া তুলে নেবার প্ল্যান করেছে বলে মনে হল। আমি প্রাণপণে নামতে আরম্ভ করলুম।

আর নেমে দেখি–

ওরা সব থ হয়ে পুঁটলিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ওটা খোলা হয়েছে আর ওর ভেতরে কাঁচাকলা! স্রেফ চারটে কাঁচকলা! সাধুভাষায় যাকে তরুণ কদলী বলা যায়।

টেনিদা নাকটাকে ছানার জিলিপির মতো করে বললে–এর মানে কী? এত কাণ্ড করে চারটে কাঁচকলা!

ক্যাবলা মোটা গলায় বললে, ঠিক চারটে। আমরাও চারজন। মাথাপিছু একটা করে।

হাবুল বললে–তা হলে আমাগো–

আর বলতে পারল না, তক্ষুনি ছটাং-ছটাং–

অদৃশ্য শত্রুর অস্ত্র ছুটে এল আমাদের দিকে। একটা পড়ল টেনিদার নাকে, আর একটা হাবুলের মাথায়। টেনিদা লাফিয়ে উঠলো-ইঁ-ইঁ-ইঁ–

হাবুল হাউ হাউ করে বললে–খাইছে–খাইছে–।

তা খাইছে খাইছে ও বলতেই পারে! দুটো সাংঘাতিক অস্ত্র—মানে পচা ডিম। পড়েই ভেঙেছে। টেনিদার মুখ আর হাবুলের মাথা বেয়ে নামছে বিকট দুর্গন্ধের স্রোত!

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পচা ডিম এসে আমার পিঠেও পড়ল। আর একটা ক্যাবলার কান ঘেঁষে বোঁ করে বেরিয়ে গেল—একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট।

ক্যাচ- কট- কট

চারটে কাঁচকলার ধাক্কা যদি বা সামলানো গিয়েছিল, পচা ডিম আমাদের একেবারে বিধ্বস্ত করে দিলে। বিশেষ যে লেগেছিল তা নয় কিন্তু তার কী খোশবু। সে-গন্ধে আমি তো তুচ্ছ স্বয়ং গন্ধরাজ ছুঁচোর পর্যন্ত দাঁতকপাটি লেগে যাবে।

হাবুল বললে-ইস, দফাখান সাইরা দিছে একেবারে। অখনি গিয়া সাবান মাইখ্যা চান করন লাগব।

আমি মিষ্টি গলায় পিনপিন করে বললুম—আমার এমন ভালো কোটটাকে—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই ক্যাবলা বললে-টেনিদা, উয়ো দেখ্খো।

ক্যাবলা অনেকদিন পশ্চিমে ছিল, চটে গেলে কিংবা খুশি হলে কিংবা উত্তেজিত হলে ওর গলা দিয়ে হিন্দী বেরুতে থাকে। পচা ডিমের গন্ধে টেনিদা তখন তিড়িং-মিড়িং করে লাফাচ্ছিল, দাঁত খিঁচিয়ে বললে- কী আবার দেখব র‍্যা? তোর কুবুদ্ধিতে পড়ে সেই জোচ্চোর কাগামাছিটার হাতে-

ক্যাবলা বললে-আরে জী, জেরা আঁখসে দেখোনা উধার-উয়ো পেড় কি পিছে।

টেনিদা থমকে গেল।

—আরে তাই তো! ওই গাছটার পেছনে কেউ লুকিয়ে আছে মনে হয়। ওই লোকটাই তাহলে ডিম ছুড়ে মেরেছে, নির্ঘাত! পীরের সঙ্গে মামদোবাজি–বটে।

টেনিদা এমনিতে বেশ আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, আমাদের পকেটে হাত বুলিয়ে দিব্যি আলুকাবলি থেকে চপ-কাটলেট পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, কিছু বলতে গেলেই চাঁটি কিংবা গাঁট্টা বাগিয়ে তেড়ে আসছে, কিন্তু কাজের সময় একেবারে অন্য চেহারা– যাকে বলে সিংহ। তখনই আমাদের আসল লিডার। আমাদের পাড়ায় ওদিকে গত বছর বস্তিতে আগুন ধরে গেল, ফায়ার ব্রিগেড পৌঁছবার আগেই একটা বাচ্চাকে পাঁজাকোলা করে বেরিয়ে এল তিন লাফে! সাধে কি টেনিদাকে এত ভালবাসি আমরা।

গাছের আড়ালে শত্রুকে দেখতে পেয়েই টেনিদা গায়ের কোটটাকে ছুঁড়ে ফেলল। বললে–হা-রে-রে-রে! আজ এক চড়ে কাগামাছির মুণ্ডু যদি কাটমুণ্ডুতে পৌঁছে না দিই তবে আমি টেনি মুখুজ্যেই নই।

বলেই ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস শব্দে এক রাম চিৎকার। তারপরেই এক লাফে ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে তীরের মতো গাছটার দিকে ছুটে গেল; আমরা হতভম্বের মত চেয়ে রইলুম, ইয়াক ইয়াক পর্যন্ত বলতে পারলুম না।

টেনিদাকে তীরের মতো ছুটতে দেখেই লোকটা ভোঁ দৌড়। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ভালো দেখা যাচ্ছিল না, তবু যেন মনে হল, লোকটা যেন আমাদের অচেনা নয়, কোথাও ওকে দেখেছি!

বনের মধ্যে দিয়ে ছুটল লোকটা। টেনিদা তার পেছনে। এক মিনিট পরেই আর কিছু দেখতে পেলুম না, শুধু দৌড়ানোর আওয়াজ আসতে লাগল। তারপরেই কে যেন ধপাস করে পড়ল, খানিকটা ঝটাপটির আওয়াজ আর টেনিদার চিৎকার কানে এল : হাবুল-প্যালা-ক্যাবলা, ক্যাচ- কট-কট! কুইক–কুইক!

ক্যাচ কট কট। তার মানে কাউকে ধরে ফেলেছে!

ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস, ইয়াক-ইয়াক। আমরা তিনজনে বোঁ-বোঁ করে ছুটলুম সেদিকে। পাহাড়ি উচু নিচু রাস্তায় ছুটতে গিয়ে নুড়িতে পা পিছলে যায়, ডান হাতে বিছুটির মতো কী লেগে জ্বালাও করতে লাগল, কিন্তু আর কি কোনওদিকে তাকাবার সময় আছে এখন! এক মিনিটের মধ্যেই টেনিদার কাছে পৌঁছে গেলুম আমরা।

দেখি, টেনিদা বসে আছে মাটিতে। তার এক হাতে একটা মেটে রঙের ধুসো মাফলার, আর এক হাতে দুটো চকোলেট। সামনে কতকগুলো কাগজপত্র ছড়ানো।

আমরা কিছু বলবার আগেই টেনিদা করুশ গলায় বললে- ধরেছিলুম লোকটাকে, একদম জাপটে। কিন্তু দেখছিস তো, পাথর কী রকম পেছল, স্লিপ করে পড়ে গেলুম। লোকটাও খানিক দূরে কুমড়োর মতো গড়িয়ে উঠে ছুট লাগাল। এদিকে দেখি, একটা পা একটু মচকে গেছে—আর তাড়া করতে পারলুম না।

ক্যাবলা বললে-কিন্তু এগুলো কী?

—সেই হতচ্ছাড়া কাগামাছি না বগাহাঁচির পকেট থেকে পড়েছে। আর ধুসো মাফলারটা আমি কেড়ে নিয়েছি। বলেই একটা চকোলেটের মোড়ক খুলে তার এক টুকরো ভেঙে নির্বিকারভাবে মুখে পুরে দিলে।

ক্যাবলা বললে-দাঁড়াও—দাঁড়াও, চকোলেট খেয়ো একটু পরে। এই মাফলারটাকে চিনতে পারছ?

—চিনতে বয়ে গেছে আমার। চকোলেট চিবোতে চিবোতে টেনিদা বললে-যেমন বিচ্ছিরি দেখতে, তেমনি তেল-চিটচিটে, বুঝলি, কাগামাছিটা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলে কী হয়, লোকটার কোনও টেস্ট নেই, নইলে অমন একটা বোগাস মাফলার গলায় জড়িয়ে রাখে!

ক্যাবলা বললে–দুত্তোর।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে–থাম।–দুত্তোর দুত্তোর করিসনি। পায়ে ভীষণ ব্যথা করছে কষ্ট হচ্ছে উঠে দাঁড়াতে। ওই যাচ্ছেতাই মাফলারটা দিয়ে আমার পাটা বেঁধে দে দিকিনি।

এতক্ষণ পরে হাবুল সেনের মাথাটা যেন সাফ হয়ে গেল একটুখানি। হাবুল বললে–হ-চিনছি তো। এই মাফলারটাই তো দেখছিলাম কদম্ব পাকড়াশির গলায়।

আমি বললুম-ঠিক-ঠিক।

টেনিদা বললে–তাই তো! আরে, এতক্ষণ তো খেয়াল হয়নি। সেই লোকটাই তো চকোলেট প্রেজেন্ট করে শিলিগুড়ি স্টেশনে আমাদের ঝাউ বাংলোয় আসতে নেমন্তন্ন করেছিল। আর সেই তো কাগামাছির চীপ অ্যাঁসিস্টান্ট-সাতকড়ি সাঁতার কী সব মুলোটুলো চুরি করবার জন্যে–

ক্যাবলা ততক্ষণে মাটিতে-পড়া গোটা দুই কাগজ কুড়িয়ে নিয়েছে। আমি দেখলুম, দুখানাই ছাপা কাগজ—হ্যাণ্ডবিল মনে হল। তাতে লেখা আছে :

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
বিখ্যাত গোয়েন্দা-লেখক
পুণ্ডরীক কুণ্ডুর
রহস্য উপন্যাস– **? ?**
পাতায় পাতায় শিহরন-ছত্রেছত্রে লোমহর্ষণ!
প্রকাশক :
জগবন্ধু চাকলাদার এন্ড কোং
১৩ নং হারান ঝম্পটি লেন, কলিকাতা—৭২

www.bengaliebook.com

ক্যাবলার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর হাবুলও হ্যান্ডবিলটা পড়ছিলুম। ওদিকে টেনিদা তখন তেমনি নিশ্চিন্ত হয়ে চকোলেট চিবিয়ে চলেছে, বিশ্ব সংসারের কোনও দিকে তার কোন লক্ষ আছে বলে মনে হল না।

পড়া শেষ করে ক্যাবলা বললে–এর মানে কী?

এইবার আমার পালা। ক্যাবলা ভারি বেরসিক ছেলে, ডিটেকটিভ বই-টই পড়ে না, বলে বোগাস। হাবুলের সমস্ত মন পড়ে আছে ক্রিকেট খেলায়–সেও বিশেষ খবর-টবর রাখে না। কিন্তু আমি? আমার সব কণ্ঠস্থ! রামহরি বটব্যালের রক্তমাখা ছিন্নমুণ্ড, কঙ্কালের হুঙ্কার, নিশীথ রাতের চামচিকে থেকে শুরু করে যদুনন্দন আঢ্যের কেউটে সাপের ল্যাজ, ভীমরুল বনাম জামরুল, অন্ধকারের কন্ধকাটা–মানে বাংলাভাষায় যেখানে যত গোয়েন্দা বই আছে সব প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি। আর পুণ্ডরীক কুণ্ডু? হ্যা, তাঁর বইও আমি পড়েছি। তবে ভদ্রলোক সেরকম জমিয়ে লিখতে পারেন না, দাঁড়াতেই পারেন না রামহরি কিংবা যদুনন্দনের পাশে। কিন্তু তাঁর তক্তপোশের পোক্ত ছারপোকা আমার মন্দ লাগেনি। বিশেষ করে সেই বর্ণনাটা যেখানে হত্যাকারীর তক্তপোশের নীচে গোয়েন্দা হীরক সেন একটা মাইক্রোফোন লুকিয়ে ফিট করে রেখেছিলেন; হত্যাকারী ঘুমের ঘোরে কথা কইত, আর দু মাইল দূরে বসে গোয়েন্দা মাইক্রোফোনের সাহায্যে তার সব গোপন কথা শুনতে পেতেন।

দু নম্বর কাগজটাও ওই একই হ্যান্ডবিল! ক্যাবলা সেটাও একবার পড়ে নিলে। তারপর আবার বললে–এর মানে কী? এই হ্যান্ডবিল কেন? কে পুণ্ডরীক কুণ্ডু? জগবন্ধু চাকলাদার বা কে?

আমি বললুম-পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা বই লেখেন, কিন্তু ওঁর বই ভালো বিক্রি হয় না। আর জগবন্ধু চাকলাদার ওঁর পাবলিশার।

হুঁ। হাবুল ধুসো মাফলারটা নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠে মাফলারটা ফেলে দিলে আর প্রাণপণে হাত ঝাড়তে শুরু করে দিলে।

আমি চমকে উঠে বললুম কী হল রে হাবুল? মাফলারের মধ্যে কী কোনও বিষাক্ত ইনজেকশন

–আর ফালাইয়া থো তোর বিষাক্ত ইনজেকশন! একটা লাল পিঁপড়ে আছিল, একখান মোক্ষম কামড় মারছে।

আহত পিঁপড়েটা তখন মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছিল। ক্যাবলা একবার সেদিকে তাকাল, তারপর আমার কোটের দিকে তাকিয়ে দেখল। কিছুক্ষণ কী ভাবল–মনে হল, কী যেন একটা গভীর রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করছে।

তারপর বললে-তোর কোটেও তো দেখছি কয়েকটা মরা পিঁপড়ে লেগে আছে প্যালা!

বললুম-বাঃ! গাছে উঠে ওদের সঙ্গেই তো আমাকে ঘোরতর যুদ্ধ করতে হচ্ছিল।

-হুঁঃ। আচ্ছা ভালো করে চারদিকের ঝোপজঙ্গল লক্ষ্য করে দেখ তো, এরকম পিঁপড়ে এখানে আছে কি না!

এতক্ষণ পরে টেনিদা বললে- কী পাগলামো হচ্ছে ক্যাবলা। কাগামাছিকে ছেড়ে শেষে পিঁপড়ে নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবি নাকি? উঃ, কদম্বটাকে ঠিক জাপটে ধরেছিলুম–একটুর জন্যে ক্যাবলা বললে-একটু থামো দিকি। কদম্ব আর পালাতে পারবে না, ঠিক ধরা পড়বে এবার। কী রে হাবুল, প্যালা, আর লাল পিঁপড়ে পেলি এখানে?

হাবুল বললে-না, আর দেখতে আছি না।

বলতে বলতে হাবুলের পিঠ থেকে কী একটা ঝোপের ওপর পড়ল। দেখলুম, সেই পচা ডিমের খোলার একটা টুকরো।

হাওয়ায় সেটা উড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাবলা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সেটাকে ধরে ফেলল। একমনে কী যেন দেখেই সেটাকে রুমালে জড়িয়ে বুক-পকেটে পুরে ফেলল।

টেনিদা বললে–ও আবার কী রে! পচা ডিমের গন্ধে প্রাণ যাচ্ছে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে পারলে বাঁচি, তুই আবার সেই ডিমের খোলা কুড়িয়ে নিচ্ছিস।

ক্যাবলা সেকথার জবাব দিলে না। বললে–টেনিদা, উঠতে পারবে?

–পারব মনে হচ্ছে! ব্যথাটা কমেছে একটুখানি।

–তবে চলো। আর দেরি নয়।

–কোথায় যেতে হবে?

-ঝাউবাংলোয়। এক্ষুনি।

আর সাঁতরামশায়? যদি তেনারে এর মইধ্যে কাগামাছি একেবারে লোপাট কইর‍্যা ফ্যালায়?–হাবুল সন্দিগ্ধ হয়ে জানতে চাইল।

–আরে, কাগামাছি কো বাত আভি ছোড় দো! আগে ঝাউবাংলোয় চলল। সব ব্যাপারগুলোরই একটা কু পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়–শুধু একটুখানি বাকি। সেটা মেলাতে পারলেই-

-আর তখুনি একটা কথা আমার মনে পড়ল। বড় বড় লেখকের অটোগ্রাফ জোগাড় করবার বাতিক আছে আমার, সেই সুবাদে আমি বছর তিনেক আগে একবার পুণ্ডরীক কুণ্ডুর সালকিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলুম। একটা জলচৌকির উপর উবু হয়ে বসে পুণ্ডরীক তামাক খাচ্ছিলেন, গলায় একটা ঢোলের মত মস্ত মাদুলি দুলছিল। ছবিটা চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। গোয়েন্দা-গল্পের লেখক, অথচ

শার্লক হোমসের মতো পাইপ খান না।বসে বসে হুঁকো টানেন আর তাঁর গলায় ঘাসের নীলচে রংধরা একটা পেতলের মস্ত মাদুলি থাকে, এটা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। কিন্তু সবটা এখন নতুন করে মনে জাগল, আর সেই সঙ্গে

আমার মগজের ভেতরে হঠাৎ যেন বুদ্ধির একটা জট খুলে গেল। তা হলে–তা হলে–

আমি তখুনি কানে কানে কথাটা বলে ফেললুম।

আর ক্যাবলা? মাটি থেকে একেবারে তিন হাত লাফিয়ে উঠল। আকাশ ফাটিয়ে আর্কিমিডিসের মতো চিৎকার করল—পেয়েছি—পেয়েছি!

কী পেয়েছিস? হাবুলের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল টেনিদা, চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কী পেলি হাতি না ঘোড়া? খামকা চেঁচাচ্ছিস কেন ষাঁড়ের মতো?

ক্যাবলা বললে– যা পাবার পেয়েছি। একেবারে দুইয়ে দুইয়ে চারচারে চার আট!

-মানে?

–সব জানতে পারবে পনেরো মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু তার আগে প্যালাকেও কনগ্রাচুলেট করা দরকার। ওর ডিটেকটিভ বই পড়ারও একটা লাভ আছে দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় ফিরেই ওকে চাচার হোটেলে গরম-গরম কাটলেট খাইয়ে দেব।

টেনিদা বললে–উহু উহু, মারা যাবে। ওর ওসব পেটে সইবে না। ওর হয়ে আমিই বরং ডবল খেয়ে নেব।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে– সত্য কথা কইছ। আমিও তোমারে হেলপ করুম। কী কস প্যালা?

আমি মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে চলতে লাগলুম। এসব তুচ্ছ কথায় কর্ণপাত করতে নেই।

পুণ্ডরীক কুণ্ডু এবং রহস্যভেদ

ঝাউ বাংলোর কাছাকাছি এসে পৌঁছুতেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সামনের বাগানের ভেতরে কাঙ্কু যেন কী করছিল—আমাদের ফিরে আসতে দেখেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই ভেতর দিকে টেনে দৌড়।

টেনিদা বললে–ও কী! আমাদের দেখে কাঙ্খা অমন করে পালাল কেন!

ক্যাবলা বললে–পালাল না, খবর দিতে গেল!

–কাকে?

ক্যাবলা হেসে বললে– কাগামাছিকে।

হাবুল দারুণ চমকে উঠল।

—আরে কইতে আছ কী! কাঙ্খা কাগামাছির দলের লোক?

–হুঁ। টেনিদা বললে–আর কাগামাছি লুকিয়ে আছে এই বাড়িতেই!

ক্যাবলা হেসে বললে–হ্যাঁ, সবাই আছে এখানে। কাগামাছি, বগাহাঁচি, দুধের চাঁছি– কেউ বাদ নেই।

টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে–ঠাট্টা নয় ক্যাবলা। ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?

কী নিয়ে আক্রমণ করবে? ওদের সম্পত্তির মধ্যে তো একটা ভাঙা হুঁকো, একগাছা মুড়োঝাটা আর একপাটি কুকুরে-চিবুনো ছেড়া চটি। সে-আক্রমণ আমরা প্রতিরোধ করতে পারব।

-ইয়ার্কি করছিস না তো?

—একদম না। চলেই এসো না আমার সঙ্গে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে ঝাউবাংলোর দোতলায় উঠে গেলুম। বাড়িতে কোথাও কেউ আছে বলে মনে হয় না। চারদিক একেবারে নিঝুম! কাঞ্ছা পর্যন্ত কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে। টেনিদা খোঁড়াচ্ছিল বটে, তবু সেই ফাঁকেই এক কোনা থেকে একটুকরো ভাঙা কাঠ কুড়িয়ে নিলে।

আমি জিগগেস করলুম—ওটা দিয়ে কী হবে টেনিদা?

–ঝাঁটা আর কোর আক্রমণ ঠেকানো যাবে। ক্যা

বলা বললে- কিছু দরকার নেই। অনেক বড় অস্ত্র আছে আমার কাছে। এসো সবাই-

কী যে ঘটতে যাচ্ছে ক্যাবলাই শুধু তা বলতে পারে! আমি মনে-মনে কিছুটা আন্দাজ করছি বটে, কিন্তু এখনও পুরোটা ধরতে পারছি না। দুরু দুরু বুকে ক্যাবলার পেছনে-পেছনে চললুম আমরা। এন্তার গোয়েন্দা বই পড়েছি আমরা রামগড়ের সেই বাড়িতে আর ডুয়ার্সের জঙ্গলে। এর মধ্যে আমাদের দুদুটো অভিযানও হয়ে গেছে, কিন্তু এবার যেন সবটাই কেমন বিদঘুটে লাগছিল। আর সাতকড়ি

নিশ্চয় সেই লোক? এখন আর আমার কোনও সন্দেহ নেই। আর ওই হ্যান্ডবিলটা–

ক্যাবলা বললে–এখানে।

দেখলুম সেই বন্ধ ঘরটার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যেটায় দুদুটো পেল্লায় তালা লাগানো! সাতকড়ি যাকে বলেছিলেন স্ট্যাকরুম–মানে যার ভেতর বাড়ির সব পুরনো জিনিসপত্র ডাঁই করে রাখা হয়েছে।

ক্যাবলা বললে- এই ঘর খুলতে হবে।

টেনিদা আশ্চর্য হয়ে বললে–এই ঘর? হাতি আনতে হবে তালা ভাঙবার জন্যে, আমাদের কাজ নয়।

ক্যাবলা মরিয়া হয়ে বললে–চারজনে মিলে ধাক্কা লাগানো যাক। তালা না খোলে, দরজা ভেঙে ফেলব।

ভাবছি চারজনে মিলে চার বছর মারো জোয়ান-হেঁইয়োলে ধাক্কা লাগলেও খোলা সম্ভব হবে কি না, এমন সময় কোত্থেকে নেহাত ভালো মানুষের মতো গুটিগুটি কাঞ্ছা এসে হাজির। যেন কিছুই জানে না, এমনি মুখ করে বললে–চা খাবেন বাবুরা? করে দেব?

তক্ষুনি তার দিকে ফিরল ক্যাবলা। বললচা দরকার নেই, এই ঘরের চাবিটা বার করো দেখি।

–চাবি? কাঞ্ছ আকাশ থেকে পড়ল!-চাবি তো আমি জানি না।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে- মিথ্যে কথা বোলো না কাঞ্ছা, ওতে পাপ হয়। চাবি তোমার প্যান্টের পকেটেই আছে। সুড়সুড় করে বের করে ফেলল।

কাঞ্ছা পাপ-টাপের কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। মাথাটাথা চুলকে বললে–জু। চাবি আমার কাছেই আছে তা ঠিক। কিন্তু মনিবের হুকুম নেই–দিতে পারব না।

–তোমাকে দিতেই হবে!

কাঞ্ছা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল!–না, দেব না।

ক্যাবলা বললে–টেনিদা, কাঞ্ছা নেপালীর ছেলে, জান দিয়ে দেবে, কিন্তু মনিবের বেইমানি করবে না। কাজেই চাবি ও কিছুতেই দেবে না। অথচ, চাবিটা আমাদের চাই-ই। তুমি যদি পায়ের মচকানিতে খুব কাতর না হয়ে থাকো–তা হলে

ব্যস, ওইটুকুই যথেষ্ট। টেনিদাকে আর উসকে দেবার দরকার হল না। ডি-লা গ্রান্ডি বলেই তক্ষুনি টপাং করে চেপে ধরল কাকে, আর পরক্ষণেই কাঞ্ছার প্যান্টের পকেট থেকে বেরিয়ে এল চাবির গোছা।

কাঞ্ছা চাবিটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল নির্ঘাত একটা দারুণ মারামারি হয়ে যাবে এবারে এই রকম আমার মনে হল। কিন্তু সে বিচ্ছিরি ব্যাপারটা থেমে গেল তক্ষুনি। কোথা থেকে আকাশবাণীর মতো মোটা গম্ভীর গলা শোনা গেল কাঞ্ছু, চাবি দিয়ে দাও, গোলমাল কোরো না।

চারজনেই থমকে গেলুম আমরা। কে বললে– কথাটা? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

আবার সেই গম্ভীর গলা ভেসে এল লম্বা পেতলের চাবি দুটো লাগাও। তা হলে বেশি পরিশ্রম করতে হবে না।

এবার আর বুঝতে বাকি রইল না। হাবুল রোমাঞ্চিত হয়ে বললে–আরে, সাঁতরামশাইয়ের গলা শুনতাছি যে।

টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে সরভাজার মতো করে বললে, মনে হচ্ছে যেন বদ্ধ ঘরটার ভেতর থেকেই।

ততক্ষণে বিদ্যুৎবেগে তালা দুটো খুলে ফেলেছে ক্যাবলা। দরজায় এক ধাক্কা দিতেই–

কে বলে স্টাকরুম! খাসা একখানা ঘর। সোফা রয়েছে, খাটে ধবধবে বিছানা। ও-পাশে যেদিকে আমাদের শোবার ঘর সেদিকের বন্ধ দরজাটার মুখোমুখি ছোট একটা প্রজেক্টার। আর–আর সোফায় যিনি বসে আছেন তিনি সাতকড়ি সাঁতরা স্বয়ং! একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।

ক্যাবলা বললে-নমস্কার পুণ্ডরীকবাবু। দাড়িটা খুলুন।

বিনা বাক্যব্যয়ে সাতকড়ি একটানে নকল সবুজ দাড়িটা খুলে ফেললেন। আর আমি পরিষ্কার দেখতে পেলুম সেই ভদ্রলোককেই তিন বছর আগে যাঁর শালকিয়ার বাড়িতে অটোগ্রাফ আনতে গিয়েছিলুম আর যিনি উবু হয়ে মোড়ার ওপর বসে বসে তামাক টানছিলেন।

টেনিদা আর হাবুল একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

–আরে!--আরে!

–এইটা আবার কী রে মশায়!

ক্যাবলা বললে-তোমরা চুপ করো। এখনি সব বুঝতে পারবে।-কুণ্ডুমশাই!

গম্ভীর হয়ে সাতকড়ি বললেন–বলে ফেলো।

–আপনার সোফার পেছনে যিনি লুকিয়ে আছেন আর ঢুকেই যাঁর নাকটা আমি একটুখানি দেখতে পেয়েছি, উনিই বোধহয় জগবন্ধু চাকলাদার?

সাতকড়ি–না, না, পুণ্ডরীক কুণ্ডু, ওরফে কুণ্ডুমশাই বললেন–ঠিক ধরেছ। তোমাদের বুদ্ধি আছে। ও জগবন্ধুই বটে।

-সোফার পেছনে ঘাপটি মেরে বসে উনি মিথ্যেই কষ্ট পাচ্ছেন। ওঁকে বেরিয়ে আসতে বলুন।

পুণ্ডরীক ডাকলেন—বেরোও হে জগবন্ধু।

জগবন্ধু সোফার পেছনে দাঁড়িয়ে উঠল। সেই মিচকে-গোঁফ ফিচকে চেহারা—শুধু গলার মেটে রঙের বিটকেল মাফলারটাই বেহাত হয়ে গেছে। কেমন বোকার মতো চেয়ে রইল আমাদের দিকে। এখন একদম নিরীহ বেচারা, যেন জীবনে কোনওদিন ভাজা মাছটি উলটে খায়নি।

সাতকড়ি বললেন বসে পড়ো হে ছোকরা, বসে পড়ো। ওরে কাঞ্ছা, আমাদের জন্য ভালো করে চা আন। আচ্ছা এখন বলল দেখি, ধরে ফেললে কী করে?

ক্যাবলা বললে-এক নম্বর, আপনার পাইন বনের কবিতা আর কদম্ব পাকড়াশির ছড়া। আপনার কবিতা শুনেই মনে হয়েছিল, ছড়াগুলোর সঙ্গে এর যোগ আছে।

-হুঁ। তারপর?

—দুনম্বর, আপনার অদ্ভুত ফরমুলা। বাড়িতে একখানা সায়েন্সের বই নেই, আছে একগাদা ডিটেকটিভ ম্যাগাজিন—অথচ আপনি সায়েন্টিস্ট? আর ধাঁ করে আপনি থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে জোয়ানের আরক মিলিয়ে দিলেন? আমরা অন্তত কলেজে পড়ি, এত বোকা আমাদের ঠাওরালেন কী করে? তখনি মনে হল, আপনি আমাদের নিয়ে মজা করতে চান কাগামাছি-টাছি সব বানান।

-বলে যাও।

–কত বলব? জগবন্ধুবাবুকে নিয়ে দার্জিলিঙে সিঞ্চলে আমাদের ছবি তুললেন সিনে ক্যামেরায়, পাশের ঘর থেকে প্রজেক্টার ফেলে ছবি দেখালেন, কাঞ্ছ না জগবন্ধু কাকে দিয়ে হাঁড়িচাঁচার ডাক শোনালেন কাগজের মুণ্ডু নাচালেন–

জগবন্ধু এইবার ব্যাজার গলায় বললে–হাঁড়িচাঁচার ডাক আমি ডেকেছিলুম। কিন্তু তোমরাই বা মাঝরাতে আমার মাথায় জল ঢাললে কী বলে-হ্যাঁ, এখনও সর্দিতে আমার মাথা ভার, নাক দিয়ে জল পড়ছে।

ক্যাবলা বললে–তবু আপনার ভাগ্যি ভালো যে ইট ফেলিনি! মাঝরাত্তিরে লোককে ঘুমুতে দেবেন না ভেবেছেন কী? তারপর শুনুন কুণ্ডুমশাই! জগবন্ধুবাবুর ধুসো মাফলার টেনিদা কেড়ে নিয়েছিল–তা থেকে একটা লাল পিঁপড়ে হাবুলকে কামড়ে দিয়েছে। তখনই বোঝা গেল, গাছে উঠে কাঁচকলা বেঁধেছিল কে! তারপরে পচা ডিম। কিন্তু এই দেখুন–পকেট থেকে হাবুলের পিঠে লেগে থাকা সেই ভাঙা ডিমের খোলাটা বের করে বললে–দেখুন, এতে এখনও বেগুনে পেন্সিলে-লেখা নম্বর পড়া যায়–৩২। আপনার রান্নাঘরে ডিমের গায়ে এমনি নম্বর দেওয়া আছে, সে আমি আগেই লক্ষ করেছি।

পুণ্ডরীক বললে–শাবাশ। আমি গোয়েন্দা-গল্প লিখে থাকি, তোমরা আমার শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হীরক সেনকেও টেক্কা দিয়েছ। কিন্তু আমাদের পরিচয় পেলে কী করে?

ক্যাবলা বললে–এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনারা সাহিত্যিক। সবুজ দাড়ি লাগালেও ভক্তরা আপনাদের চিনতে পারে–যেমন প্যালা চিনে নিয়েছে। তা ছাড়া এই দেখুন হ্যান্ডবিল–টেনিদা যখন জগবন্ধুকে চেপে ধরেছিল, তখন ওঁর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আর জানতে কী বাকি থাকে!

পুণ্ডরীক আর জগবন্ধু দুজনেই হাঁড়ির মতো মুখ করে চুপ করে রইলেন। ক্যাবলা বললে–এবার বলুন আমাদের সঙ্গে এব্যবহারের মানে কী? শুনে খাচ-খ্যাচ করে উঠলেন কুণ্ডুমশাই।

সূচিপত্র

–এত বুঝেছ, আর এটুকু মাথায় ঢুকল না যে আমার বই ভালো বিক্রি হচ্ছে না–আমি আর জগবন্ধু–দুজনেরই মন মেজাজ খারাপ। বিলিতি বই থেকে টুকতে যাব, দেখি আমার আগেই যদুনন্দন আঢ্য আর রামহরি বটব্যাল সব মেরে দিয়ে বসে আছে। প্লট ভাববার জন্যেই এখানে এসেছিলুম। জগবন্ধুও আসছিল আমার এইখানেই, পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা। দেখে ওর মাথায় মতলব খেলে যায়–তোমাদের কাজে লাগিয়ে একটা সত্যিকারের গোয়েন্দা গল্প বানালে কেমন হয়? একটা কথা বলিকবিতা-বিতা আমার একদম আসে না। জগবন্ধু পাবলিশার হলে কী হয়, মনে-মনে ও দারুণ কবি–ওগো পাইনটাও ওরই লেখা। ও-ই ছড়া লিখে তোমাদের ঘাবড়ে দেয়–আমাকে সবুজ দাড়ি পরায়, সব প্ল্যান করে তকে থেকে আমরা তোমাদের সঙ্গে টাইগার হিলে আর সিঞ্চলে যাই, জগবন্ধু ছবি তোলে আর ছুঁচোবাজি ছাড়ে–তারপর–তারপর তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু তোমরা সব ভণ্ডুল করে দিলে হে। আর একটু জমাতে পারলে আমার দুর্দান্ত একটা ডিটেকটিভ বই তৈরি হয়ে যেত!

কুণ্ডুমশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন–আর সত্যজিৎ রায় মশাইকে ধরেটরে যদি সেটাকে ফিল্ম করা যেত–

ক্যাবলা চটে বললে- সত্যজিৎ রায় ওসব বাজে গল্প ফিল্ম করেন না। সে যাক–পচা ডিম ছুঁড়ে যে আমাদের জামা-টামা খারাপ করে দিলেন, ধোয়াবার খরচা এখন কে দেবে?

কুণ্ডুমশাই আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন আমিই দেব। ওহে জগবন্ধু, একখানা চকোলেট বার করো দেখি, খেয়ে মনটা ভাল করি।

জগবন্ধু বললে- চকোলেট কোথায় স্যার? পকেটে যা ছিল এরাই তো মেরে দিয়েছে।

তারপর?

তারপর আবার কী থাকবে? দুপুরে বজ্রবাহাদুর গাড়ি নিয়ে এল পুবং থেকে। আমরা সেই গাড়িতে চেপে তার ওখানে বেড়াতে গেলুম। তার বাড়িতে খুব খাওয়া-দাওয়া হল। তার নাম, ভাবভঙ্গি যেমনই হোক, সে ভীষণ ভালো লোক কত যে আদর যত্ন করলে সে আর কী বলব! তারপর সন্ধেবেলায় তারই মোটরে দার্জিলিঙে ফিরে এলুম। সেই স্যানিটারিয়ামে।

কিন্তু আমাদের বোকা বানিয়ে পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা গল্প লিখবেন, তা-ও কি হতে পারে? তাই তিনি তাঁর উপন্যাস ছাপবার আগেই সব ব্যাপারটা আমি সন্দেশে ছেপে দিলুম। তারপরেও যদি কুণ্ডুমশাই বইটা লিখে ফেলেন, তা হলে আমি তার নামে গল্প চুরির মোকদ্দমা করব।

আর তোমরাও তখন আমার পক্ষেই সাক্ষী দেবে নিশ্চয়!